দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ২১ সংখ্যা ❖ ১৭ মার্চ ২০২৬



➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

- সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্তুতি গাইছেন তৃতীয় বিশ্বের নেতারা — শুভ বসু — ৩
- মোদীর ভারত ক্রমশ আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে — অমিতাভ সিংহ — ৪
- রাজনীতি ও দলবদল — মজিবুর রহমান — ৬

আন্তর্জাতিক

- ইরান আক্রমণের কোনও দুর্বল অজুহাতও দাঁড় করাতে পারছে না আমেরিকা-ইজরায়েল — মনিরুল হক — ৮
- ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের হামলা জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী — সৌর বসু — ১১

বাংলাদেশ

- সোজন বাদিয়ার ঘাট চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু করেছেন পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল — ১২
- বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীতকে অসম্মান — ১৩

দেশের খবর

- SIR ষড়যন্ত্র নিপাত যাক — মোসারেকুল আনোয়ার — ১৩
- সোনম ওয়াংচুক মামলা: সুপ্রিম কোর্টের শুনানির আগে হঠাৎ জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার — প্রতাপ সাহারান — ১৬
- অগ্নিবিধ্বস্ত দণ্ডকারণ্যের বাঙালি উদ্বাস্তুদের ওপর ঘৃণ্য আক্রমণ — ডা সুবোধ বিশ্বাস — ১৭
- মুখ্যমন্ত্রীর বকেয়া ডি. এ. দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও কনফেডারেশনের বিবৃতি — ১৯

গণমাধ্যম

- আপনি কি আগামী আড়াই মাস টি.ভি. তে সংবাদ দেখা বন্ধ রাখতে পারেন না? — রভিশকুমার — ১৯
- প্রকাশিত হল সাংবাদিক সুকুমার মিত্রর বই; ‘শিরোনামের আড়ালে: তদন্তমূলক সাংবাদিকতা’ — ২১
- আপনজনের কথা ‘কাকু, আমি কিন্তু মুসলমান’, ফোনের ওপারে কাতর কণ্ঠস্বর’ — চন্দ্রপ্রকাশ সরকার — ২২

নাগরিক স্মৃতিচারণ

- যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও সাধনা ঔষধালয় — লিয়াকত হোসেন খোকন — ২৩

স্মরণ

- সমুদ্র দত্ত, সম্পাদক, শ্রমজীবী ভাষা — ২৪

পরিবেশ

- আমি চাই গাছ কাটা হলে শোকসভা হবে বিধানসভায় — অপর্ণা চক্রবর্তী — ২৫

ধারাবাহিক ইতিহাস

- কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ২৫
- জরুরী অবস্থা পরবর্তী পরিস্থিতি — সুশান্ত দাশগুপ্ত — ২৭
- বন্ধুতার পাতা — সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল , ২ দফায় ভোট হবে ।খুবই সুচিন্তিত ভাবে ভোটের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে । বাকি চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যথা কেরল , অসম ও পন্ডিচেরিতে ভোট হবে ৯ এপ্রিল এবং তামিলনাড়ুতে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিলের আগে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গোটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যাতে এই রাজ্যে ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেই সুযোগ মহামান্য নির্বাচন কমিশন করে দিয়েছেন ।নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (পড়ুন সঙ্ঘ পরিবার) রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে । ভোটের ঠিক আগে রাজ্যপাল বদল হয়েছে। এসআইআর চলাকালীনই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বোঝাই করে ফেলা হয়েছে রাজ্যকে। ভোট ঘোষণার ঠিক পরেই মধ্যরাতে বদলে দেওয়া হল রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে ।দিনের বেলায় বদলানো হল ডি.জি , কলকাতার সি.পিকে। সবটাই ভারতবর্ষে প্রথমবার। এর ঠিক আগে, প্রধানমন্ত্রী দলীয় সভায় এসেছেন না সরকারি, বোঝা যায়নি, সেই ব্যবধানটুকুও মুছে ফেলা হয়েছে। এবং তাঁর জনসভার দিন গোলমালে কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী নামেনি, এই নিয়ে কমিশন জবাবদিহি চেয়েছে। ফলে রাজ্যপাল, সচিব এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী, এই ত্রিশক্তি দিয়ে নির্বাচন হবে বোঝাই যাচ্ছে। আর নির্বাচনী আচরণবিধি নরেন্দ্র মোদী , অমিত শাহ এবং তাদের ছোট বড় অনুগামীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটাতো আমরা গত এক দশক ধরেই দেখছি । এরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম করে আক্রমণ করতে পারেন । রাজীবকুমার বা জ্ঞানেশ কুমার সি.ই.সি. থাকলে কিছুই হয় না ।এরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিশ্বাস করেন না ।এদের কাছে রাজ্য সরকারের অস্তিত্বটাই বিরক্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় । মাথার উপর চন্দ্র-সূর্য আছে, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী , বঙ্গে সুবাদার রাজ্যপাল, ঢাকের বাঁয়া নির্বাচন কমিশন, আর দিল্লির কেন্দ্রীয় বাহিনী। ওই দিয়েই চলে যাবে।

এস আই আর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন এই রাজ্যে শেষ হয়নি ।অথচ নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেল ।ভোটার তালিকা অসম্পূর্ণ রেখে ভোটের ঘোষণা এরকম অদ্ভুত নির্বাচন দেশ বা নির্দিষ্ট ভাবে বললে পশ্চিমবঙ্গ কখনও দেখেনি ।সমস্ত বিরোধী দল এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ।বৈধ ভোটার ভোটের তালিকা থেকে বাদ গেলে বিভিন্ন দল আদালতে যাবেন ।

পশ্চিমবঙ্গের এস.আই.আর ঘোষিত হয় ২৭ অক্টোবর। ৪ নভেম্বর এনুমারেশন শুরু হয় ।খসড়া তালিকা প্রকাশ হয় ১৬ ডিসেম্বর , ২০২৫। এস.আই.আর- এর আগে ভোটার ছিলো ৭,৬৬,৩৭,৫২৯ ।নাম বাদ গেল ৫৮,২০,৮৯৯ জনের। এর মধ্যে আছে মৃত ভোটার,স্থান ত্যাগ, অন্য জায়গায় নাম, ফর্ম ৭ জমা করে ভোটারের নামে আপত্তি ইত্যাদি ।সংশোধনের পর ৭,০৮,১৬,৬৩০ ।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের পর ভোটারের সংখ্যা হল ৭,০৪,৫৯,২৮৪ । রাজ্যের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মনোজ আগরওয়াল বলেছেন ফর্ম ৭ জমা দিয়ে আপত্তি করায় মোট নাম বাদ পড়েছে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার জনের । অথচ নির্বাচন কমিশন নিজেই গত ২০ জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি - অভিযোগ পর্ব শেষ হবার পর বলেছিল , ফর্ম ৭ এর মাধ্যমে ৯৯ হাজার ১১৮ জনের নাম বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছিল। প্রশ্ন হল, যদি ৯৯ হাজার ১১৮ ৬জনের নাম বাদ দেওয়ার দাবি ওঠে , সেক্ষেত্রে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার জনের নাম ফর্ম ৭ এর ভিত্তিতে বাদ গেল কী করে ?

ফর্ম ৬, ৬ এ ' র মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন জমা পড়েছিল ৯ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেশি । অথচ নতুন ভোটার হলেন মাত্র ১ লক্ষ ৮৪ হাজার । সংবাদে প্রকাশ অন্তত প্রায় ৮ লক্ষ নতুন আবেদনকারীর আবেদন গ্রাহ্য হলোনা । সেগুলি সি.ই.ও ' র দপ্তরে পড়ে আছে ?

প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচন কমিশন হচ্ছে কমিশন অফ ডিলিশন , কমিশন অফ ইনক্লুশন নয় । আদতে এটি কোনও নির্বাচন কমিশনই নয় ।এটি কার্যত শাসক দলের আজ্ঞাবহ দপ্তর । পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়ে কাহিনির এখানেই শেষ নয় । এইবার লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ওই ৭,০৪,৫৯,২৮৪ জনের মধ্যে আরও ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম শুনানি সাপেক্ষে বিচারাধীন (Adjudicated) রয়েছে । অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙালি Micro Observer রা AI এর সাহায্য নিয়ে ৬০ লাখ ভোটারকে বিচারাধীন করেছেন এবং স্পেশাল রোল অবজার্ভাররা তা অনুমোদন করেছেন। ব্যাপক হয়রানির জন্য রাজ্যে শতাধিক ব্লক লেভেল অফিসার ও সাধারণ মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বা অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে

কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে আপাতত ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ভোটার। ২০২৪ এ ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। ২০২১ এ ছিল ৭ কোটি। ২০১৬তে ছিল ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ। অর্থাৎ, গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার সংখ্যা কমে গেছে।

সঙ্ঘ পরিবার কোনোদিনই সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না । যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখন এদের মুখপত্র Organiser লিখেছিল সাধারণ নিরক্ষর মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছে নেহরুর স্টান্টবাজি । দলিত , সংখ্যালঘু , মহিলাদের ভোটাধিকার আর বর্ণহিন্দু ভূস্বামীদেরও একই ভোটাধিকার সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে । পাঠক , অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন , এই নির্বাচন কমিশন যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে তাঁরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু ,দলিত ও মহিলা ।

সংসদীয় গণতন্ত্র নয় এরা চায় পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আইয়ুব খানের নির্ধারিত গণতন্ত্র (Guided Democracy)। যে ব্যবস্থায় শাসক ভোটার ঠিক করে দেয়। ভোটাররা শাসক ঠিক করে দেয় না।

প্রবন্ধ

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্তুতি গাইছেন তৃতীয় বিশ্বের নেতারা

শুভ বসু

আজকাল রাজনৈতিক পোস্ট দিতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবী জুড়ে শুধু হতাশার ছায়া। মতাদর্শহীন শুধুমাত্র মুনাফা আর জাতীয় স্বার্থের জন্যে যুদ্ধ আর মেরুদন্ড হীন তৃতীয় বিশ্বর নেতারা যুদ্ধর স্বপক্ষে স্তুতি গাইছে। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস চলে গেলো। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে নারী এবং শিশুদের অধিকার নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট অঙ্গীকার দেখলাম না। কোথাও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা নারীদের অধিকার পদলিত করছেন আর কোথাও সাম্রাজ্যবাদীরা নারীদের অধিকারের নাম করে সেই নারীদের উপর বোমা বর্ষণ করছেন।

১৯৭১ এর ৭ ই মার্চ বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য এক অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অগণিত মানুষ সেই বক্তৃতা শুনে স্বাধিকারের প্রশ্নে এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু সংবাদে পড়লাম ৭ ই মার্চের বক্তৃতা বাজানোর অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীর কারাবাস হয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যুদ্ধ করছে। ৭ ই মার্চ ১৯৭১ সালে এই বাংলাদেশের মানুষই শেখ মুজিব কে নায়ক বানিয়েছিলেন। আর স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরাঙ্গনাদের উপর অত্যাচার করেছিল এক সেনা বাহিনী তার কোনো উল্লেখ নেই নারী দিবসে। আমরা আসলে কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে গেছি। এখন শুধু গোধরা আর গাজার উল্লাস।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের স্মরণে থাকবে রবীন্দ্রনাথ কামাল পাশা দিবস শুরু করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তুরস্কর এই নেতা বাংলার কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বহু আগে থেকে। নজরুল তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। কামাল পাশা প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদের সামনে মাথা নত করেননি বলেই প্রাচ্যের সম্মান পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যিনি একসময়ে মুসলিনির অতিথি হয়েছিলেন বলে বিতর্কের সম্মুখীন হন তিনি কিন্তু মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আবার নগুচির সঙ্গে বিতর্কে জড়ান জাপানের চীন আক্রমণের প্রতিবাদ করে। পরে নগুচি তাঁর ভুল স্বীকার করে নেন তখন কবি আর বেঁচে নেই ।

ভারতের সভ্যতার সঙ্গে ইরানের যোগ বহুদিনের। ফার্সি ভারতের দরবারী ভাষা ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষা ছিল কবিদের। আমির খসরু , মালেক তাজ আল দিন দেহলভী , সারমাদ কাশানি , আব্দুল -কাদির বেদিল, দ্বারা শিকো , মির্জা মাজহার জান -এ -জানা বা মীর ত্বকী মীর সবার পরিচিত। কিন্তু বহু হিন্দু ফার্সিভাষাতে রচনা করেছিলেন। ১৬২৬ সালে দিল্লির একজন কায়স্থ গিরধর দাস কর্তৃক রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় । চন্দ্র ভান 'ব্রাহ্মণ', সম্ভবত প্রথম হিন্দু লেখক যার একটি সম্পূর্ণ দীবান রয়েছে এবং গদ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনাও রয়েছে। পাঞ্জাবের একজন চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ শাহজাহানের দরবারে একজন মুন্সি ছিলেন, যা তিনি তাঁর ঐতিহাসিক-আত্মজীবনীমূলক রচনা 'চাহার চামান'-এ সংবেদনশীলতা এবং মার্জিতভাবে চিত্রিত করেছেন। রহস্যময় জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাঁর কাব্যশৈলী সমালোচকদের দ্বারা তার ধ্রুপদী মার্জিততা এবং স্পষ্টবাদী পদ্ধতির জন্য প্রশংসিত হয়েছিল । আরেকজন, যদিও কাব্যিকভাবে কম প্রতিভাবান, হিন্দু লেখক ছিলেন বনওয়ালি দাস 'ওয়ালি' । শাহজাহানের আমলের লেখক মথুরা দাস 'হেন্দু' সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তিনি একটি দীবান এবং দুটি মসনবী রচনা করেছিলেন– লায়লা ও মজনু এবং কোসরো ও শিরিন। প্রায় ১০০০ পংক্তির তাঁর দীবানটি চন্দ্রভান এর মতোই একই শৈলীতে রচিত হয়েছিল। তবে, হেন্দু বর্ধিত রাদিফ কঠিন ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং সমগ্র ১৮ শতকে হিন্দু লেখকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় যারা সমস্ত ফার্সি কাব্যিক রূপে তাদের মতো চেষ্টা করেছিলেন, বিভিন্ন ধরণের রচনা তৈরি করেছিলেন। বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে, বেদান্ত একত্ববাদী দার্শনিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিককে ইসলামী ঐতিহ্যের সুফি এবং এরফানি ধারণার সাথে চিহ্নিত করার প্রবণতা বেশি ছিল। একই সাথে ভারতীয় বিষয়বস্তুর জন্য নিবেদিত মসনবীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময়ের হিন্দু গজল লেখকরা, তাদের মুসলিম প্রতিরূপের মতো, ভারতীয় রীতির প্রতি ঝোঁক দেখিয়েছিলেন। কবিদের কবিতার সংকলন সহ অভিধান এবং জীবনীমূলক স্কেচের প্রতি হিন্দুদের আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই শাখাগুলিতে হিন্দুরা অন্তত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। লালা টেক চন্দ 'বাহর' রচিত বাহার-এ'আজম, শিয়ালকোটি মাল 'ভারস্ত', এবং , বিন্দ্রবান দাস 'ককোশগু' রচিত সাফিনা-ই ককোশগু, এবং লক্ষ্মী নারায়ণ 'শফিক' আওরঙ্গাবাদী রচিত গোল-এ রা'না এবং শাম-এ গারিবান উল্লেখ করা উচিত।

দিল্লিতে মির্জা আব্দুল কাদের 'বিদেল' (প্রথম খ্রিষ্টাব্দ; ১৬৪৪-১৭২০) কে ঘিরে গড়ে ওঠা বৃত্তের সাথে যুক্ত অনেক হিন্দু কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আনন্দ রাম 'মোক-লেস' , যিনি কেবল একটি চমৎকার দিওয়ান তৈরি করেননি, ওয়ালেহ দাগেস্তানিকে তাঁর সময়ের সেরা হিন্দু ফার্সি কবি হিসেবে প্রশংসা করতে প্ররোচিত করেছিলেন , বরং তিনি গদ্যে বিভিন্ন রচনাও লিখেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে মেরাত আল-এস্তেলাহ, মুঘল ভারতে ব্যবহৃত ফার্সি কাব্যিক বাক্যাংশ এবং প্রবাদ বাক্যের জন্য নিবেদিত একটি প্রধান অভিধানিক পাঠ; লালা আমানত রায় 'আমানত' যার প্রধান রচনা ছিল জেলওয়া-য়ে দাওত , ভাগবত পুরাণের উপর ভিত্তি করে রোবাই এবং গজলের সাথে মিশে প্রায় ৮০০০ পংক্তির একটি মসনবী লেখেন এবং এটি অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় কারণ এটি কৃষ্ণের রূপ ও কর্মের ইসলামী ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক রাখে; এবং লালা শিবরাম দাস ক্ষ্মহোয়াক্ষ্ম হিন্দুদের পবিত্র শহর মথুরার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি রচনা লিখেছিলেন, যার নাম গোলগাষ্ট-এ বাহার-এ এরম, যা বিদেলের চাহার 'ওনসোর এর আদলে তৈরি, এবং একটি দিবান যা মূলত গজল নিয়ে গঠিত, যা তার গুরুর শৈলী দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত। কিছু তদকেরার প্রমাণ অনুসারে বিদেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন লখনউয়ের হিন্দু লাল সুখরাজ 'সবকাত' ।

রামমোহন রায় ছিলেন ফার্সি ভাষার এক লেখক। তাঁর প্রথম গ্রন্থ তুহফাত -উল -মুয়াহহিদিন বা একেশ্বরবাদের উপহার ফার্সিতে রচিত গ্রন্থ। রামমোহন মিরাত উল আখবার বলে ফার্সিতে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ফার্সিতে আলেম ছিলেন। তিনি হাফিজ এর দিবান পড়ে তাঁর উপাসনা সমাপ্ত করতেন। গিরিশ চন্দ্র সেন যিনি বাংলা ভাষায় কোরান শরীফের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন তিনিও ফার্সিভাষায় আলেম ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ফার্সি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। জাহাঙ্গীর ভাকিল ছিলেন প্রাচীন পাহলিকের শিক্ষক। আর মৌলানা জিয়াউদ্দিন ছিলেন আধুনিক ফার্সির শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের যোগাযোগ ছিল বহুদিনের। ১৯২৬ সালে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার পথে তাঁর জাহাজ ইস্তাম্বুলে দু দিন থেমেছিল। রবীন্দ্রনাথ তুর্কি সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ে বই চেয়েছিলেন কামাল আতাতুর্কের কাছে। রাষ্ট্রপতি মুস্তাফা কামাল এফেন্দি তাঁকে ৪১ টি বই দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইরান গিয়েছিলেন প্রতিমা দেবী , কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ভারতীয়-পারসিক বন্ধু দিনশা ইরানি কে নিয়ে ১৯৩২ সালে । তিনি ইরান থেকে ইরাকে যান। রবীন্দ্রনাথ পারস্যের শাহ কে অনুরোধ করেন বিশ্বভারতীতে ফার্সি ভাষা শিক্ষার একজন অধ্যাপককে পাঠাতে। সেই অনুরোধের ফলে ইরানের ইব্রাহিমপুর দাউদ বিশ্বভারতীতে যোগ দেন ১৯৩২ সালে এবং ১৯৩৪ সালে পর্যন্ত থাকেন তিনি। সেই সময় দাউদের তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিন রবীন্দ্রনাথের স্ব নির্বাচিত ১০০ টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেটি সদ্ বন্দে তাগোর বলে পরিচিত হয়। ১৯৬১ সালে ইব্রাহিমপুর দাউদ তা আবার প্রকাশ করেন। আমার 'নকশাল-খ্যাঁকশেয়াল' বা 'সেকু-মাকু' পরিচয়ের পরিবর্তে আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসাবে এই নিবন্ধ লিখছি। আমি ইরানের ইসলামী শাসকদের সমর্থক নই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী। ইরানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুদিনের। তাই বিশ্বভারতীর ফেলুদার ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে এই এলোমলো লেখাটা লিখলাম। আমার প্রিয় কবির কবিতা দিয়ে শেষ করলাম :

তোমার ললাটে পড়ানু এ মোর শ্লোক
ইরানের জয় হোক।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

মোদীর ভারত ক্রমশ আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে

অমিতাভ সিংহ

নাগরিকের গত সংখ্যায় লিখেছিলাম আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যচুক্তি আমাদের সার্বভৌমতার ওপর একটা বড় আঘাত। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে ভারত যে নরেন্দ্র মোদী ও সঙ্ঘ পরিবারের কর্তৃত্বে আমেরিকার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে তা নীচের ঘটনাক্রম দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৬ মার্চ,২০২৬ : আমেরিকার রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্ট বললেন 'রাজস্ব দপ্তর আমাদের সহযোগী ভারতকে রুশ তেল যা ইতিমধ্যে সমুদ্রে(জাহাজে) আছে তা কেনার অনুমতি দিয়েছে। আমরা তাদের গত শীতকালে রুশ তেল কেনা বন্ধ করতে বলেছিলাম।তারা তা বন্ধ করেছিলেন। বর্তমানে গোটা বিশ্বে তেল সরবরাহে একটা ফারাক দেখা দিয়েছে। সেটা পূরণ করতেই রুশ তেল কেনার অনুমতি দিয়েছি ভারতকে।'

এই কথাটিই গত ১১ ফেব্রুয়ারি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন ক্ষ্ম এখন থেকে আমেরিকা বলবে, আমরা কোথা থেকে তেল কিনব,কোথা থেকে কিনব না। রাশিয়া থেকে তেল কিনব কিনা তা আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেবে।আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে সিদ্ধান্ত নেবেন না।ক্ষ্ম রাহুল গান্ধীর আশঙ্কা একমাস পার হওয়ার আগেই সত্য হল। আসলে আমেরিকার হাতে থাকা এপস্টিন ফাইলে মোদীর নাম থাকা ও গৌতম আদানীকে আমেরিকার সমন, এই দুই চাপের কাছে মাথা নত করে আমেরিকার কাছে দেশের জ্বালানি নীতির সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া হল যার কুশীলব স্বয়ং মোদী। স্বঘোষিত বিশ্বগুরু যে কখন বিশ্বভৃত্যে পরিণত হয়ে গেছেন তা বুঝতে পারেন নি।সম্ভবত তাই তিনি সংসদের ধারেকাছে ঘেঁসছেন না।অথচ বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী বক্তৃতা ও নিয়ম করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও কুকথার বন্যা ছোটাতে তার সময়ের অভাব হচ্ছে না।

৭ মার্চ,২০২৬ : কেন্দ্রীয় সরকার এক বিবৃতিতে জানাল যে রুশ তেল কিনতে কারও অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। ভারত সেসব জায়গা থেকে তেল কেনে যেখানে সাশ্রয় হয়। অথচ আমরা জানি রাশিয়ার কাছ থেকে কম দামে তেল কেনার জন্য ট্রাম্প ভারতের ওপর ২৫% শুল্ক ও ২৫% জরিমানা চাপিয়েছিল।তারপর গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ঘোষনা করে দেন বাণিজ্য চুক্তি হয়ে গেছে। ভারত রাশিয়া থেকে আর তেল কিনবে না। তার জন্য শুল্কের হার ২৫% থেকে ১৮% করে দেওয়া হল।

এবার একটু বাস্তব সত্যটার সামনে দাঁড়ানো যাক।

ভারতে যে তেলের প্রয়োজন তার প্রায় নব্বই শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিছুদিন আগেও রাশিয়া থেকে যা তেল আসত তার অর্ধেক তেল এখন ভারত আমদানি করছে রাশিয়া থেকে। বরং বেশী দামে ভারত এখন তেল কিনছে আমেরিকার কাছ থেকে। সবই হয়েছে ট্রাম্পের রক্তচক্ষুর কাছে বাধ্য ছেলের মত মাথা নত করার কারণে।

বিদেশ দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের মতে ' আমেরিকা ভারতকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমেরিকার স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তির কথা।তারা বলছে আমেরিকা অনুমতি দিলে তবেই ভারত সাময়িকভাবে রাশিয়া থেকে তেল কিনতে পারবে কারণ ভারত আমেরিকার কৌশলগত কক্ষে ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে।'

৮ মার্চ,২০২৬ : ট্রাম্প বিবৃতি দিলেন ভারতের ওপর থেকে চাপ একটু কমানোর জন্য রাশিয়া থেকে তেল কেনার ছাড় দেওয়া হয়েছে। মানে আমেরিকা একটু দয়া দেখাল আর তা নিয়ে আমরা খুশীতে থাকব। এ তো ব্রিটিশ উপনিবেশের মত আমেরিকা উপনিবেশ কায়েম করার প্রথম ধাপ।

ট্রাম্প যে এই অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে তা মোদী সরকার ভাবতেও পারে নি। অপারেশন সিঁদুর এর পর একই জিনিস দেখা গিয়েছিল। হঠাৎ ই আমেরিকা থেকে ট্রাম্প ঘোষণা করলেন তিনি ভারত পাক যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছেন। যে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা ভারত ও পাকিস্তানের যৌথভাবে করার কথা তা কি করে ট্রাম্প করল সেই প্রশ্ন উঠলেও তার কোনও জবাব ভারত সরকার বা প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। এবং সত্য এটাই যে ট্রাম্পের ঘোষণার ভ পর অপারেশন সিঁদুরের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর অন্ততঃ ছত্রিশবার ট্রাম্প এই কথাগুলো ঢাক পিটিয়ে বলেছেন। মোদী শাহ রাজনাথ স্পিকটিনট।

কদিন আগেই ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি ও তার পরিবারকে আমেরিকা তুলে এনে দেশটি প্রকারান্তরে দখল করে নিল যার কোনও প্রতিবাদ করল না ভারত। যখন হুগো স্যাভেজ ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি , তখন তাঁর দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার জন্য আমেরিকা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ চালায় ।কিন্তু ড. মনমোহন সিংয়ের সরকার আমেরিকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ভেনেজুয়েলার কাছ থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখে ।সেই ভেনেজুয়েলার তেল এখন ভারতে ঢুকছে বেশী দামে আমেরিকার মাধ্যমে, এটাই খবর। এসবের ফলে আমাদের বহু বছরের নীতি আদর্শ বিসর্জন দেওয়া হল।

ইরানকে আক্রমণ করলো আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে তার দপ্তরে হত্যা করা হল। মোদীর মুখ থেকে একটা নিন্দা আজও বের হল না।আয়াতোল্লা আলি খামেনেই এর জন্য মামুলি শোকবার্তা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হল মৃত্যুর পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর। এটাই কি আমাদের বিদেশনীতি? একসময়ের বন্ধু দেশ ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের এত অবনতি মোদীর আমলে ! ২০১৮ সালেও ইরানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য ছিল ১৮০০ কোটি ডলার তা এখন মাত্র ১৬৮ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। দশভাগের একভাগেরও কম। চাবাহার বন্দর ছিল আমাদের সঙ্গে ইরানের একটা যোগসূত্র। আমেরিকার চাপে তাও সরু সুতার ওপর ঝুলছে। ইজরায়েল সেখানেও ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়েছে যার ফলে পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে খবর। ভারতের তরফে কোন নিন্দা হয়েছে? আসলে প্রযুক্তির দিক থেকে ধরলে ইজরায়েল অনেকটা এগিয়ে আছে। এই প্রযুক্তির বেশীরভাগ ব্যবহার হয় অসৎ উদ্দেশ্যে, ক্ষমতা করায়ত্ত করার কাজে। যেমন পেগাসাস

স্পাইওয়ার। মোদী প্রচুর দামে এই স্পাইওয়ার ইজরায়েলের কাছ থেকে কিনেছিল রাহুল গান্ধীসহ বিভিন্ন বিরোধীদের ও নিজের দলের সন্দেহভাজন নেতাদের ফোনে আড়ি পাততে। যে প্রযুক্তি আমাদের দেশে রাজীব গান্ধীর সময় থেকে উদ্ভাবনের ভিত তৈরী হয়েছিল ও গত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে সফলভাবে তা প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম তা কেন আজ পারছি না ? কেন ইজরায়েলের মত মানবতার শত্রু রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হবে? কেনই বা ইজরায়েলে যখন ইরানের ওপর আক্রমনের ষড়যন্ত্র চলছে সেসময় মোদী সেই দেশ সফর করলেন ? এর অর্থ কি মোদী তথা ভারতও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার ? ইরানের ওপর হামলা শুরু হয় মোদী ভারতে ফিরে আসার দুদিনের মধ্যে। সুতরাং সন্দেহ তো হবেই। আবার খামেনেই হত্যার পর টু শব্দ অব্দি করলেন না মোদী। এতই ভীরু যে ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ১৬ ইঞ্চিতে নেমে এল।

আরেকটা ঘটনা উল্লেখ না করলে নিবন্ধটি সম্পূর্ণ হবে না। ভারত মহাসাগরে ভারতের আমন্ত্রণে নৌসেনার মহড়ায় যোগ দিতে আসা ইরানের যুদ্ধজাহাজ আইরিশ দেনার ওপর আমেরিকার টর্পেডো হামলার ফলে জাহাজটি ডুবে গেল। ৮৭ জন ইরানী মারা গেল। শ্রীলংকার নৌসেনা ও বায়ুসেনা ৭৯ জনকে উদ্ধার করল। ভারত তার নিন্দা করল না। অতিথি দেশের প্রতি এই আচরণ কবে করেছি আমরা ? মুখে বলি অতিথি দেবায় ভব,আর কাজে? এই জাহাজে কোন প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম ছিল না,কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তাহলে এই হামলার নিন্দা হবে না কেন ? বিশেষ করে যখন তারা আমাদের আমন্ত্রনে আমাদের অতিথি হিসাবে বিশাখাপত্তনমে এসেছিল নিছক মহড়ার জন্য যা ভারতের রাষ্ট্রপতির পর্যবেক্ষণে হয়েছিল।

একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। ২০০৩ সাল আমেরিকা ইরাকে হামলা চালাল এই মিথ্যা অজুহাতে যে ইরাক পরমানু গবেষণা করছে। তেলের জন্য আমেরিকা ইরাক দখল করল ও সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হল। সেসময় বিজেপির সরকার,অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রথা মেনে এই ঘটনার নিন্দা করলেন।২০১১ সালে যখন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বোঝাপড়া অনেকটাই সুদৃঢ় তখন লিবিয়া আক্রান্ত হয় আমেরিকার দ্বারা। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ড. মনমোহন সিং সরকার। মনমোহন সিং রাষ্ট্রসংঘে তার নিন্দাসূচক প্রতিবাদ করলেন। এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে ভারতের ইতিহাসে। ভারত কখনও ভীরু জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা পায় নি।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ইন্দিরা গান্ধীর বীরগাথা তো স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। ১৯৭১ এর ৯ নভেম্বর ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন ইন্দিরা গান্ধী। নিক্সন বলেন পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করা যাবে না। ভারত যেন পাকিস্তানকে আক্রমণ না করে। সেক্ষেত্রে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবে না। এরপর ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়। ভারত প্রবলভাবে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে।নিক্সনের নির্দেশে হেনরি কিসিন্‌জার ইন্দিরা গান্ধীকে ফোন করে সেনা প্রত্যাহার করতে বলেন। উত্তরে ইন্দিরা বলেন 'এই বিষয়ে কারও উপদেশ দেওয়ার দরকার নেই'।এরপর আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসে। তার পেছন পেছন রাশিয়ার বিশটি রণতরী ধাওয়া করলে সপ্তম নৌবহর তাদের রণতরীর মুখ ঘুরিয়ে পশ্চাৎপসারণ করতে বাধ্য হয়।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বাই জঙ্গী হামলার পর আমেরিকার রাস্ট্রপতি বারাক ওবামা তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন ভারতের নিজের নিরাপত্তার জন্য যা করার তা করতে হবে। অন্যদিকে ক'মাস আগে ঘটে যাওয়া পহেলগামে জঙ্গী হামলার পর মোদীবন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য ছিল ভারত ও পাকিস্তান দুজনেই আমাদের বন্ধু। এরপর আমেরিকা পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে হোয়াইটহাউসে নিমন্ত্রণ করে নৈশভোজ করাল। ট্রাম্প বার বার বলছে যে তারা কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করে দেবে। ভারত আজ এক সার্বভৌম রাষ্ট্র না আমেরিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (vassal state of US) যা আমেরিকার স্বার্থের কাছে বন্ধক দেওয়া রাষ্ট্র তা আর বোঝার উপায় নেই।

রাজনীতি ও দলবদল

মজিবুর রহমান

রাজনীতি একটি বৃহৎ, প্রাচীন ও বহুল আলোচিত বিষয়। প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খ্রিস্টপূর্ব) 'দ্য রিপাবলিক', এরিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) 'পলিটিক্স' ও নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) 'দ্য প্রিন্স' রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মাইলফলক হয়ে রয়েছে। 'রাজনীতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'পলিটিক্স' এসেছে গ্রিক 'পলিস' থেকে যার অর্থ 'নগর-রাষ্ট্র'। এজন্য রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলকে বোঝানো হয়। অন্যকথায়, রাষ্ট্র বা সমাজের শাসন সংক্রান্ত নীতিমালা বা যাবতীয় কর্মকাণ্ডই হলো রাজনীতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজনীতি রাজা বা বাদশা কর্তৃক অধীনস্থ প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ এবং ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনার মধ্যে

সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রে জনস্বার্থে সরকার পরিচালনার নীতি হিসেবে রাজনীতির রূপান্তর ঘটেছে। উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) 'রাজনীতি' শব্দের অর্থ করেছেন রাজন্য(কিং)+ নীতি(জাস্টিস) বা 'রাজার ন্যায়বিচার'। রাজনীতিকে 'রাজার নীতি' বলারও একটা চল রয়েছে। তবে 'ন্যায়বিচার' ও 'নীতি' পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও এক জিনিস নয়। নীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ, আইন ও পরিকল্পনা, যা শাসনের ভিত্তি। অন্যদিকে, ন্যায়বিচার হলো সেই নীতির আলোকে প্রমাণের ভিত্তিতে আইনানুগ ও নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অর্থাৎ, নীতি হলো 'কীভাবে শাসন করা হবে' আর ন্যায়বিচার হলো 'কীভাবে ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করা হবে'। রাজনীতিকে 'নীতির রাজা' বা শ্রেষ্ঠ নীতিও বলা হয়ে থাকে। অটো ভন বিসমার্কের (১৮১৫-১৮৯৮) কথায়, 'রাজনীতি হলো সম্ভাবনার শিল্প'। অর্থাৎ, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে যা সম্ভব, তা অর্জন করার এটি একটি প্রক্রিয়া। রাজনীতির একটি প্রধান উপাদান হলো রাজনৈতিক দল। স্বৈরশাসনের দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দুই-একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক দল হলো সমমনা নাগরিকদের একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠী, যারা নির্দিষ্ট আদর্শ বা নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। দলীয় গঠনতন্ত্র, নেতা, সদস্য ও সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং শাসকদল বা বিরোধীদল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ভাবাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত-- বামপন্থী ও ডানপন্থী বা দক্ষিণপন্থী। বামপন্থা সমাজে সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। ডানপন্থা পুঁজিবাদী আদর্শ তথা ব্যক্তিগত মালিকানা, ঐতিহ্য, রক্ষণশীলতা, শ্রেণিবিন্যাস, বেসরকারি শিল্প, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং জাতীয়তাবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করে। কিছু দক্ষিণপন্থী দল ধর্ম বা সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতি করে। ভারতে বহুসংখ্যক বামপন্থী ও ডানপন্থী দল রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো সারা বছরই নানান কর্মসূচি পালন করে। প্রচারণার সময় নেতৃবৃন্দ নিজের দলের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা করেন। প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জন থাকে। রাজনৈতিক ভাবাদর্শের কঠিন কঠিন কথা দলের নেতৃবৃন্দ সভা সমিতিতে বলেন কিন্তু সাধারণ মানুষ সাধারণত সেসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা সাধারণত কোনো দল থাকে না। তারা দেখে কোন্ দল বা সরকার কেমন কাজ করছে, তাদের মনের কথা বলছে অথবা তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে কী দিচ্ছে। উন্নয়ন হচ্ছে কিনা। এসবের ভিত্তিতেই তারা ঠিক করে কার পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দেবে।

চূড়ান্ত লক্ষ্য বা গন্তব্য এক হলেও সেখানে পৌঁছানোর পথ বা পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্যের দরুন বড় বা জনপ্রিয় নেতানেত্রীদের নতুন দল গঠনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ১৯৩৯ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করার কৌশল নিয়ে মূলত গান্ধীজির সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং নতুন দল ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন ও রাশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন নিয়ে গুরুতর মতপার্থক্য হয় জ্জ এই বিষয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের ভিতরও মতের অমিল হয় জ্জ অবশেষে একমত হতে না পেরে ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিআই(এম) গঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি পরেও একাধিকবার ভেঙেছে। আর, কংগ্রেস ভেঙে তো প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই একাধিক আঞ্চলিক দল তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলনের তীব্রতা নিয়ে খুশি হতে না পেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। দলের মধ্যে মানিয়ে নিতে না পেরে অথবা কোণঠাসা হয়ে পড়ে অনেকেই রাজনীতি ছেড়ে দেন। সিপিআই(এম)-এর নৃপেন চক্রবর্তী ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়রা দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পুরানো দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বা বহিষ্কৃত হয়ে নতুন দল গঠন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে নীতিহীনতার অভিযোগ উঠতে দেখা যায় না। নীতিহীন বা সুবিধাবাদী হওয়ার অভিযোগ ওঠে যখন কোনো নেতা এক দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন কারণে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাজনীতি একটি নেশা যা সহজে ছাড়া যায় না। একজন নেতা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া অথবা মঞ্চে বক্তৃতা করার মধ্যে একটি রোমাঞ্চ অনুভব করেন। নিজের ভাবনার দ্বারা দলীয় অথবা সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার মধ্যে একটা আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি থাকে। দলের মধ্যে কোনো নেতার যখন গুরুত্ব কমতে থাকে, তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েন তখন তিনি চেষ্টা করেন অন্য কোনো দলে গিয়ে নেতা হিসেবে তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে। এক্ষেত্রে তিনি যে দলের বিরুদ্ধে এতদিন বিষোদ্গার করেছেন সেই দলেই তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। নতুন দলের পক্ষে এবং পুরানো দলের বিপক্ষে বক্তৃতা করতে তত্ত্ব ও তথ্যের অভাব ঘটে না কারণ প্রতিটি দলেরই কিছু ভালো ও কিছু খারাপ দিক থাকে। প্রয়োজন মতো সেগুলো উল্লেখ করা হয়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতীক উর রহমান এই ধরনের ঘটনার উদাহরণ।

সম্প্রতি রাজনীতির নেশা থেকে পেশায় উত্তরণ ঘটেছে! রাজনীতি সবচেয়ে কম পড়াশোনা ও প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করে অনেক অর্থ উপার্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রচুর। পৌরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরাও অবৈধভাবে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারেন। জনপ্রতিনিধি না হয়েও শুধুমাত্র দলীয় নেতার হবার সুবাদে অনেক কামানো যায়। একজন খেলোয়াড় যে ক্লাবে বেশি টাকা পান সেই ক্লাবের হয়ে খেলেন। একজন রাজনীতিকও যে দলে ভালো পদ পান সেই দলে থাকেন! প্রথমে ব্যক্তিস্বার্থ সুরক্ষিত করেন, তার পর জনস্বার্থ নিয়ে ভাবেন!

রাজনৈতিক সভা সমিতিতে মেহনতি মানুষের জন্য অনেক ভালো ভালো কথা বলা হলেও রাজনীতিকদের জীবনচর্চায় তার খুব একটা প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় না। যিনি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করেন তিনিই হয়তো বাড়িতে একজন গরিব মানুষকে যত কম মজুরিতে খাটিয়ে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করেন। রিক্সা চালকদের কষ্ট দেখে যিনি মঞ্চ থেকে অশ্রু বিসর্জন করেন তিনিই সামান্য পাঁচ-দশ টাকার ভাড়া নিয়ে চালকের সঙ্গে দরকষাকষি করেন। কিন্তু শপিং মলে বিল মেটানোর সময় প্রেস্টিজ ডাউন হওয়ার ভয়ে বারগেনিং থেকে বিরত থাকেন। কথা ও কাজে দ্বিচারিতা স্পষ্ট।

রাজনৈতিক বক্তব্য আর ব্যক্তিগত ভাবনা অনেকসময়ই এক হয় না। তাই যে নেতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লম্বা চওড়া ভাষণ দেন তিনিই হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে সাম্প্রদায়িক। আবার কোনো কোনো নেতা মঞ্চ থেকে চরম সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বললেও ব্যক্তিগত জীবনে অসাম্প্রদায়িক এমনকি অধার্মিক হন। যেমন, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও বিনায়ক দামোদর সাভারকার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সাম্প্রদায়িক হলেও ব্যক্তিগত জীবনে অধার্মিক ছিলেন। আজকের দিনেও 'গো-মাতা'র প্রতি ভক্তি প্রদর্শনকারী নেতাকে গো-মাংস ভক্ষণ করে রসনাতৃপ্তি করতে দেখা যায়। অনেক হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা 'লাভ জেহাদ'-এর প্রবক্তার জামাই ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান।

ডানপন্থী দলের নেতানেত্রীরা দলবদলে সিদ্ধহস্ত। ব্রেকফাস্ট করার সময় যিনি কংগ্রেস, তিনিই লাঞ্চ টাইমে তৃণমূল আর ডিনারের টেবিলে বিজেপি। গান্ধীজির অনুগামী গডসের ভক্ত হয়ে যায়। তবে দক্ষিণপন্থীরা কখনও কোনো বামপন্থী দলে যোগদান করেন না। এর একটি প্রধান কারণ হলো বামদলে নতুন গিয়েই নেতা অথবা সাংসদ বিধায়ক হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থী দলে গিয়ে সহজেই সেই সুযোগ পেয়ে যান। এজন্য সম্প্রতি বামপন্থী নেতাদের মধ্যে দলবদলের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করে দীর্ঘদিনের বামপন্থী নেতা শেষ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জির মধ্যেই সত্যিকারের বামপন্থা খুঁজে পাচ্ছেন। বামপন্থী কমরেড ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি বিসর্জন দিয়ে হয়ে যাচ্ছেন সাম্প্রদায়িক রামপন্থী। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ছেড়ে বলছেন 'জয় শ্রীরাম'। বামপন্থী দলে সত্যিকারের বামপন্থার চর্চা হলে এরূপ হওয়ার কথা নয়। মুখে আত্মত্যাগ, সততা ও ধর্মনিরপেক্ষতা আর মননে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও ভোগবাদ থাকলেই এমন পরিবর্তন প্রকাশ পেতে পারে।

রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা জনসাধারণের মানসিকতা অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন অথবা পাল্টে নেন। কথায় আছে, জনগণ যেমন চায় তেমন শাসক পায়। দলবদলু, দুর্নীতিবাজ ও সাম্প্রদায়িক নেতানেত্রীরা যখন জনপ্রিয় হন, ভোটে জেতেন এবং বারবার সরকার গঠন করেন তখন বুঝতে হবে যে, সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনায় গণ্ডগোল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জনসাধারণের একটি বড় অংশের মধ্যে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেছে। এজন্য তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জনগণের উত্তরণ না ঘটলে রাজনীতির পাঁক পরিস্কার হবে না। দলমত নির্বিশেষে দলবদলের রাজনীতিকে ঘৃণা করা দরকার। রাজনীতিকে ধর্মের সংশ্রব থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। উন্নত রুচি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বার্থ বিবর্জিত রাজনীতিই জনস্বার্থকে রক্ষা করতে পারে। তার জন্য সাধারণ মানুষকেও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই নীতিহীন সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরাস্ত হতে পারে।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক।)

আন্তর্জাতিক

ইরান আক্রমণের কোনও দুর্বল অজুহাতও দাঁড় করাতে পারছে না আমেরিকা-ইজরায়েল জোট

মনিরুল হক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির মাপকাঠিতে আমেরিকাকেই অনেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। নিজেদের সম্পদ ও কর্তৃত্ব বাড়াতে এই সময়কালে তারা পৃথিবীর বহু দেশেই অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান নামিয়ে এনেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাদের এইসব

হস্তক্ষেপ তথা অভিযানে তারা নিজের দেশের মানুষের সমর্থন পেয়েছে। বেয়াড়া কমিউনিস্টদের সাবাড় করার জন্য ভিয়েতনাম যুদ্ধেও সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সায় ছিল। রাশিয়াকে প্রতিহত করার জন্য আফগানিস্তান অভিযানে সেদেশের ৯২ শতাংশ মানুষ সমর্থন করেছিলেন। এই দুই অভিযানের করুণ ফলাফলের স্মৃতি এখনও অমলিন। আর, এবারের এই ইরান অভিযানের ফল কি হবে, তার প্রভাব কতোটা সুদূরপ্রসারী হবে তা জানার জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু জনমত সমীক্ষা বলছে, সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইরান আক্রমণকে কোনও ভাবেই সমর্থন করেন নি। শুধু তাই নয়, বহির্বিশ্বে ইজরায়েল ছাড়া কোন দেশই ট্রাম্প সাহেবের এই নির্লজ্জ আক্রমণকে সমর্থন করেনি বা হাতি-ঘোড়া নিয়ে 'জো হুজুর' বলে এগিয়ে আসে নি। ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, পোল্যান্ড, এইরকম কিছু দেশ 'আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা'র নীতি অনুসরণে নমঙ্ম নমঙ্ম জপ করছে ঠিকই কিন্তু অষ্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, মাল্টা এবং বলকান দেশসমূহ এই আক্রমণকে অপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেছে। আর স্পেন তো যথারীতি এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজ আমেরিকার ইরান আক্রমণকে যে সব বিশেষণে বিভূষিত করেছেন সেগুলি হল, 'Extraordinary Mistske-- Violation of International Law-- Unjustified'. শুধু তাই নয় স্যাঞ্চেজ হানাদারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন,- 'NO TO WAR'. চারদিকে যখন এই অবস্থা ট্রাম্প সাহেবের হাতে পেন্সিলটাও নেই যে ইরান আক্রমণের সমর্থনে অন্তত একটা কুযুক্তি পেশ করবেন বিশ্ববাসীর সামনে।

কুযুক্তি একটা লেখা হয়েছিল সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করে ইরাক দখলের সময়। ইরাক গোপনে পরমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র উৎপাদন করছে এই ছিল অভিযোগ। দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যক্তিদের একাধিক দল সম্ভাব্য সমস্ত কেন্দ্র পরীক্ষা করেও কোথাও কোন মারণাস্ত্রের সন্ধান পায়নি। তা সত্বেও বেছে বেছে এক ঈদের দিনে সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ইরাককে ধ্বংস করা হয়। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কটাক্ষ করে সালমান রুশদি বলেছিলেন, আজকাল আমেরিকায় নানান রকম আগাছা জন্মাচ্ছে, তাদেরকে 'Bush' বলে ডাকা হয়। রুশদির কথায় একটু ভুল ছিল; ওগুলো আগাছা নয়, পরগাছা।

আমেরিকার নতুন পরগাছার নাম 'ট্রাম্প'। তিনি ঠিক করেছেন তিনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু কোথাও যদি অশান্তি না থাকে তাহলে কি হবে? হবে, তিনি সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবেন, সেই এলাকা ধ্বংস করবেন আর তারপর প্রতিষ্ঠা করবেন 'শ্মশানের শান্তি'। তাঁর তালিকা দীর্ঘ। গাজা-ভেনেজুয়েলা হয়ে এখন তিনি ইরানে। তাঁর অভিযোগ ইরান পরমাণু সমৃদ্ধকরণের কাজ করছে, তারা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে ফেলেছে অথবা তৈরি করার পথে। তারা যদি পরমাণু শক্তিধর হয়ে ওঠে তবে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর শান্তি প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। এই এলাকার সৌদি আরব, ইউ এ ই, কুয়েত, কাতার, বাহারিন প্রভৃতি দেশে আমেরিকার যে সব সামরিক ঘাঁটি আছে, সন্নিহিত সমুদ্রে তাদের যে সব রণতরী আছে; যে গুলোর উপর ভিত্তি করে তারা মধ্যপ্রাচ্যের মাটির তলার তেলের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করেছে, মাটির উপরে যে সব স্থাবর সম্পত্তির অংশিদারী কায়েম করেছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের এই বিপুল সম্পত্তির পাহারাদার বানিয়ে রেখেছে; সবই জলাঞ্জলি যাবে। অনেকেই ট্রাম্পকে বিকৃতমনা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন এবং এভাবে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, লগ্নি পুঁজির আগ্রাসন, মুনাফা এবং আরও মুনাফার লক্ষ্য কে ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। মনে রাখতে হবে, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মানেই লগ্নি পুঁজির সেরা বাজি। সে ট্রাম্প হোন বা বুশ-বাইডেন-রেগন-কার্টার-ওবামা, যিনিই হোন না কেন।

এই সুযোগে আমাদের বিশ্ব ব্যবস্থায় পরমাণু অস্ত্র নীতি ও নৈতিকতা ঠিক কি অবস্থায় আছে, একটু দেখা যাক। পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত প্রথম পাঁচটি দেশ হল আমেরিকার, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চিন। এরা কুলীন। বর্তমানে পৃথিবীর পরমাণু অস্ত্রের ৯৬আছে এদের হাতে। তবে পরমাণু অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে ভীতি কারও কম নয়। এই প্রেক্ষিতেই ১৯০ টি দেশ একটি 'পারমানবিক অস্ত্র অপ্রসারণ' চুক্তি সম্পাদন করে যেটি ১৯৭০ সাল থেকে কার্যকরী হয় এবং যার মূল লক্ষ ছিল, ১) পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারণ বন্ধ করা, ২) ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং ৩) পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা। পরবর্তী কালে দেখা যায়, প্রথম দুটি উদ্দেশ্য তেমন সফল না হলেও ৩য় লক্ষ্যটির দোহাই দিয়ে আরও অন্তত পঞ্চারটি দেশ - ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া এবং ইজরায়েল পরমাণু অস্ত্রে নিজেদের সুসজ্জিত করেছে। এর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান ১৯৭০ সালের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি, উত্তর কোরিয়া স্বাক্ষর করলেও পরে চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছে , আর ইজরায়েল স্বাক্ষর তো করেই নি টুঁ, বরং স্বীকারই করে না যে তারা পরমাণু শক্তিধর। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চার তো কোন শেষ নেই। ২০১৭ সালে বাজারে এলো নতুন এক চুক্তিপত্র যা লাগু হল ২০২১ সালে এবং এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির ক্ষেত্রে চুক্তির খুঁটিনাটি মেনে চলা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হল। এখানে বলা হল, পরমাণু অস্ত্রের ১) উন্নতিবিধান তথা

আধুনিকীকরণ করা, ২) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, ৩) মজুত করা এবং ৪) ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই চুক্তিটি অনুমোদন করল মাত্র ৭০ টি দেশ। কিন্তু পরমাণু অস্ত্রে বলীয়ান ৯টি দেশের কেউ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করল না! অর্থাৎ তাদের নতুন এই পরমাণু অস্ত্রনীতি মেনে চলার কোন বাধ্যকতা থাকল না। তারা আগের মতোই পরমাণু অস্ত্র নিয়ে নিজস্ব ঢঙে চলতে থাকবে। আবার পারমাণবিক অস্ত্র মজুত সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকলেও বেলারুশে রাশিয়ার এবং বেলজিয়াম, জার্মানি, ইটালি, হল্যান্ড ও তুরস্কে আমেরিকার পরমাণু অস্ত্র মজুত করা আছে। আসলে আর নতুন কোন দেশ যাতে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে না পারে তার জন্যই আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তী চুক্তিপত্রটি। আমাদের আলোচ্য দেশ ইরান প্রথম চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করলেও এই দ্বিতীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। তাহলে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো অন্য যে কোন দেশের মতো ইরানও চালিয়ে যেতে পারে। আর পৃথিবীর কোথাও পরমাণু অস্ত্র তৈরি হচ্ছে, এমন খবর কোন ফেরেস্তাও যদি এনে দেয় তাহলেও সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকার কোন আইন-ই আমেরিকাকে দেয় নি।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিন সপ্তাহ জুড়ে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যে শান্তি আলোচনা চলছিল সেখানে ইরান 'পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' নীতিকেই আঁকড়ে ধরে ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সমঝোতার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, 'Historic oppurtunity within reach'. তিনি আশা করেছিলেন পরবর্তী সভাতেই এই ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু মাত্র একদিন বাদেই আমেরিকান-ইজরায়েলি মৃত্যুদূত আছড়ে পড়ল তেহরানে। ইরান ইসলামিক রিপাবলিকের প্রধান আয়াতোল্লা খামেনি সহ অনেকেই হত্যা করল আমেরিকা। তারা ভেবেছিল এই হামলায় ভীত হয়ে পড়বে ইরান এবং সুড়সুড় করে পরের সভায় এসে তাদের শর্তে দাসখত লিখে দেবে ইরানের প্রতিনিধিরা। না, সেটা হয় নি। ইরান প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছে।

এখন এটা পুরোদস্তুর যুদ্ধ। আমেরিকার উদ্দেশ্য ইরানের তেলের ভান্ডার দখল করা। অপরদিকে ইরানের লক্ষ্য নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করা। তারা জানে শুধু প্রতিরোধই যথেষ্ট নয় প্রতিআক্রমণ দরকার। পার্শবর্তী আরব দেশসমূহে অবস্থিত আমেরিকান সেনাঘাঁটিগুলি তারা আক্রমণ করছে, আক্রমণ করছে ইজরায়েলকেও। দু'সপ্তাহ হতে চলল, নমনীয়তার কোন লক্ষণই ইরান দেখাচ্ছে না, তাদের অবস্থান বরং আরও দৃঢ়। তারা যুদ্ধকে আরও ছড়িয়ে দিতে চাইছে যাতে যুদ্ধের আঁচ সবার গায়েই লাগে। অপরদিকে আমেরিকা-ইজরায়েলকে দেখে মনে হচ্ছে কোন কিছুই তাদের পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে না। ট্রাম্প সাহেব কখনও বলছেন, 'যুদ্ধে জিতে গেছি', কখনও বলছেন 'এইবার যুদ্ধ থেমে যাবে' আবার কখনও বলছেন, 'ইরান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল'। তবে একটা কথা জানা গেছে যে ট্রাম্পের বিশেষ দূত চার্লস উইটকফ ইরান কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কোন পাত্তা পান নি। উল্টে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান যুদ্ধ বন্ধের জন্য তিনটি শর্ত রেখেছেন, - ১) ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি ও আঞ্চলিক অধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে হবে, ২) দেশে হামলার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৩) ভবিষ্যতে আর কোন হামলা হবে না তার আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি সুনিশ্চিত করতে হবে। এদিকে জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত ৩৬ হাজার আমেরিকান বেসামরিক মানুষ দেশে ফিরে গেছেন কিন্তু সেখানকার ১৯ টি সামরিক ঘাঁটি ও ৪০ হাজারের বেশি সামরিক সদস্য এখন ইরানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের তথ্য অনুযায়ী ৮ হাজার ইউরোপীয়কে দেশে ফেরৎ আনা হয়েছে। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ এশিয়ার দেশগুলি থেকে বহু লক্ষ মানুষ ওই এলাকায় কর্মরত। তারাও আজ বিপদের মুখে, কয়েকজন মারাও পেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানির প্রধান জলপথ হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে গেছে যার এক পাড়ে ইরানের ভূমি। বহুদিন আগে থেকেই ইরান বলে আসছে, আক্রান্ত হলে তাদের বাজি হবে হরমুজ প্রণালী। আতঙ্কে কোন জাহাজই এখন হরমুজ প্রণালী পার হচ্ছে না। আবার ইরান ও অন্যান্য আরব দেশের তৈলক্ষেত্র গুলো জ্বলছে। ওপেক তেল উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। নিরপেক্ষ দেশ ব্রাজিল বা নরওয়ের উৎপাদন হঠাৎ বাড়িয়ে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব নয়। এই যুদ্ধের আগে তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৬০-৮০ ডলার । যুদ্ধের মধ্যে তার দাম উঠেছে ১২০ ডলার পর্যন্ত। ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আর জ্বালানি সঙ্কট মানে সর্ব ক্ষেত্রেই সঙ্কট। বিশ্ব ব্যবস্থাই সঙ্কটে পড়েছে।

ইরানের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও ভারত

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে এসেছে। কিন্তু বিশ্বগুরুর শাসনকালে সে ভূমিকা একেবারে তলানিতে। এতোদিন দেখে এসেছি তিনি পোশাকে মহাপুরুষ, অন্তরে কাপুরুষ। কিন্তু এখন সন্দেহ হয়, তিনি 'হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাইরে' হয়ে যাননি তো! আমেরিকার এই ইরান আক্রমণের নিন্দা করা দূরে থাক, উল্টে জাতিসংঘে ইরান বিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েছে ভারত। আয়াতোল্লা খামেনিকে

সপরিবারে ও সপারিষদে হত্য করার পরও একটা সহানুভূতি সূচক বাক্যও সোনামুখ থেকে বেরুলো না প্রভু ট্রাম্পের ভয়ে। ঘটনা ঘটার পাঁচ দিন পর অনুগত জয়শঙ্করবাবুকে ইরান দূতাবাসে পাঠিয়েছিলেন আর নিজে তের দিনের মাথায় ইরানের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছিলেন (সম্ভবত ট্রাম্প সাহেবের নির্দেশ পেয়ে)। এদিকে দেশে জ্বালানি সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। না-পাওয়া গ্যাস সিলিন্ডারের দামও ৬০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ঠগীদের মতো।

পৃথিবীর কোথাও কোন যুদ্ধ লাগলেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বৃত্তীয় তরঙ্গের মতো। কিন্তু সে প্রভাব কখনও শুভ হয় না। যুদ্ধের শেষে যে ফল পাওয়া যায় তা সবসময়েই হয় কুফল, সুফল নয়। যাঁরা প্রলয়ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকেন তাঁদের অনেকের কাছে যুদ্ধ একটা ইভেন্ট। কতো জাহাজ ডুবল, কতো দ্রোন উড়লো, কতো মিসাইল ছুটলো তার খবরে আর দৃশ্যে মশগুল থাকেন; নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কোন একটি পক্ষকে সমর্থনও করেন এবং সেই পক্ষের জয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু যুদ্ধে কারও জয় হয় না সে যতোই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার হোক না কেন। মহারাজ অশোক কলিঙ্গযুদ্ধ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন, বিকিন্তু বাকি পৃথিবী সেই কলিঙ্গকালেই পড়ে আছে। যুদ্ধ আসলে নিজেই আদিম, অসংস্কৃত; আমাদের বারবার টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার সেই আদিম জগতে। আসুন না, এই যুদ্ধের আবহে, আদিমতা উদযাপনের এই যজ্ঞভূমির মধ্যেই সবাই পেড্রো স্যাঞ্চেজের মতো বলে উঠি - "NO TO WAR".

ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের হামলা জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী

সৌর বসু

পশ্চিম এশিয়ায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে আমেরিকা এবং ইসরাইল যৌথভাবে ইরানকে আক্রমণ করেছে। ইরানের সঙ্গে যখন পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখনই আঘাত হেনেছে ইজরায়েল এবং আমেরিকা। অত্যন্ত দুঃখজনক এই ঘটনা । এর অভিঘাত যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করতে পারে। এই যুদ্ধ নিয়ে সমগ্র বিশ্ব অজানা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে।কারণ কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না এই সংঘাত কতদিন স্থায়ী হবে।

এই সংঘাতের সূচনা হয় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরানের উপর ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার মাধ্যমে যা অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে জাতিসংঘ সনদের বিভিন্ন নীতির পরিপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ইসরাইলের লক্ষ্য হলো পশ্চিম এশিয়ায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং চীন এবং রাশিয়ার এই অঞ্চলে কৌশলগত উপস্থিতিকে মোকাবিলা করা।

বিগত কয়েক দশক ধরে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল পশ্চিম এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক মহল যাকে ‘ ডিপ স্টেট’ বলে এবং হোয়াইট হাউস দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণে আনার। তাদের এই আকাঙ্কার প্রধান অন্তরায় ইরান। সেই কারণে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের হস্তক্ষেপ নতুন কিছু নয়। কারণ আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম এশিয়ার, শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের অভিযোগ উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ১৯ ৭৩ সালে চিলির প্রেসিডেন্ট সালফাদর আলেন্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। এই ঘটনার পিছনে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-এ র হাত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যান্ডিনিস্তা সরকারকে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় অবস্থিত কিউবার সমাজতান্ত্রিক ক্যাস্ট্রোর সরকারকে উৎখাত করার বহু চেষ্টা করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছিল। বিপুল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আধুনিক সময়ের অন্যতম আক্রমণাত্মক প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তিনি দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে এক বছরের মধ্যে সিরিয়া ইয়েমেন ,নিকারাগুয়া ভেনেজুয়েলা সহ আটটি দেশে সামরিক আঘাত হেনেছেন ,যা একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

পশ্চিম এশিয়াতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিক বিতর্কিত ঘটনা ঘটিয়েছে।। লিবিয়াতে গাদ্দাফিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা এবং হত্যার ঘটনা, ২০০৩ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আক্রমণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বিতর্কিত পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম। ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এই দাবিতে যে সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন কোন অস্ত্রের সন্ধান বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পশ্চিম এশিয়ায় গাজা সহ বিভিন্ন দেশে বেসামরিক মানুষের ওপর আক্রমণ নেমে এসেছে। প্যালেস্টাইন এবং সংলগ্ন অঞ্চলে হাসপাতাল, স্কুল, বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ করে ইসরাইলিরা শিশু মহিলা সহ নিরপরাধ ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে হত্যা করেছে।

অপরদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত,ওমান, কুয়েত এবং সৌদি আরবের মতো কয়েকটি উপসাগরীয় রাষ্ট্র ইরানকে ঘিরে সাম্প্রতিক সংঘাত নিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীরব থেকেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও নৌ বাহিনীর শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে তাদের এই সর্তকতা অবলম্বন। বিশেষত মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ যখন উপসাগরের জলে টহল দিচ্ছে, এবং প্রতিবেশী দেশ গুলিতে সামরিক ঘাঁটি বৃদ্ধি করছে, তখন আঞ্চলিক দেশগুলির পক্ষে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা কঠিন কাজ ।

এদিকে ইরান পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করেছে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ কে লক্ষ্যবস্তু করেছে বলে জানা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ইরানের পর্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক সক্ষমতা রয়েছে। যা সংঘাতকে দীর্ঘায়িত এবং আরো তীব্র করে তুলতে পারে। বস্তুতপক্ষে ইরান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে। কারণ এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার প্রভাব এসে পড়বে বিশ্ব অর্থনীতির উপর। আন্তর্জাতিক জ্বালানির বাজারে অনিশ্চয়তার কারণে ইতিমধ্যেই তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। উপসাগরীয় দেশগুলিতে এশিয়ার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউরোপীয় কর্মী কর্মরত, ফলে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে।

বর্তমানে বিশেষ উদ্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইরান কর্তৃক হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ তেল পরিবাহিত হয়। ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল এই সামুদ্রিক পথে আসে। ফলে এই পথ বন্ধ করে দেওয়া হলে তা এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে পারে, বিশেষ করে বৈশ্বিক অর্থনীতির অবনতি ঘটলে। সমালোচকদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসের পূর্বানুমোদন ছাড়াই সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা দেশের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুধু ওই অঞ্চলকেই ধ্বংস করবে না, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং শান্তিকেও হুমকির মুখে ফেলবে।এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বিশ্ব আশা করছে যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সংঘাতের অবসান ঘটবে।

বাংলাদেশ

সোজন বাদিয়ার ঘাট চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু করেছেন পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোজন বাদিয়ার ঘাট বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কবি জসীমউদদীনের অত্যন্ত সুপরিচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। গ্রাম বাংলার অপুর্ব অনবদ্য রূপকল্প এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্যের প্রধান চরিত্র মুসলমান চাষির ছেলে সোজন ও গদাই নমুর মেয়ে দুলালী (ওরফে দুলি)। আর তার সঙ্গে বিগত জমিদারি আমলের সামন্ততান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার চালচিত্র। ১৯৩৩ সালে কবি এই কাব্যটি লেখেন মাত্র ৩০ বছর বয়সে।

পল্লীকবি জসীমউদদীন আহমদের ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন চলচ্চিত্রনির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। গোপালগঞ্জের চান্দার বিল অঞ্চলে ছবিটার শুটিং শুরু হয়।এ পর্যন্ত ছবিটার ষাট ভাগ শুটিং সমাপ্ত হয়েছে।

‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’-এর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন তানভীর মোকাম্মেল। চিত্রগ্রহণে রয়েছেন রাকিবুল হাসান, শিল্পনির্দেশক ও প্রধান সহকারী পরিচালক হচ্ছেন উত্তম গুহ। ছবিটার কাস্টিং ডিরেক্টর ও পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছেন চিত্রলেখা গুহ। ছবিটার সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সৈয়দ সাবাব আলী আরজু এবং স্থিরচিত্র গ্রহণ ও বিহাইন্ড দি সীন শুট করছেন অপরাজিতা সঙ্গীতা ও সানু মাণিক। চলচ্চিত্রটার সহ-প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন কবি জসীমউদদীনের কন্যা হাসনা জসীমউদদীন মওদুদ। তসোজন বাদিয়ার ঘাটদ চলচ্চিত্রটার সহকারী পরিচালকেরা হচ্ছেন সৈয়দ সাবাব আলী আরজু, সগীর মোস্তফা ও সন্দীপ মিস্ত্রী। কোরিওগ্রাফিতে রয়েছেন মারিয়া ফারিহ্ উপমা।

দু’ঘন্টা দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রতে অভিনয় করেছেন তনয় বিশ্বাস (সোজন), রাদিফা নারমিন (দুলী), দিহান (ছোট সোজন), শ্রেয়া বৈদ্য (ছোট দুলী), চিত্রলেখা গুহ, কাজী রাজু, শাহ আলম দুলাল, আহসানুল হক মিনু, জয়িতা মহলানবিশ, সংগীতা চৌধুরী, দেবাশীষ

ঘোষ, শুভাশীষ ভৌমিক, উত্তম গুহ, রিমু রোজা খন্দকার, মারিয়া ফারিহ্ উপমা, সৈয়দ সাবাব আলী আরজু, টুনটুনি সোবহান, কাজী ইব্রাহীম, জহির বাচ্চু, ইকবাল আহমেদ, মেহেদি আল আমীন, মতিউর সুমন, সরন সাহা, অমিতাভ রাজীব, জুবায়ের জাহিদ, আজম শেখ, সাইদুল হক, রেজাউল করিম রেজা, প্রশান্ত কর্মকার, অলোক বসু, দেবদাস সাহা, নব কুমার, মনোজ মন্ডল, রিজভিনা মৌসুমী, পারভীন পারু, সুলতানা কানিজ, নাজমুন্নাহার লিজা, স্বপ্না বৈদ্য, শাহানা সিদ্দিকা, রিপা মন্ডল, চৈতালী মন্ডল, নির্ঝর চৌধুরী, কবির ও অন্যান্য।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ছবিটির সকল কাজ এ বছরই সমাপ্ত হবে এবং নভেম্বর মাসে চলচ্চিত্রটি রিলিজ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীতকে অসম্মান

সংবাদ সংস্থা : গত ১২ মার্চ বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবার সময় জামাত ও এনসিপির সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ আসনে বসে ঝিমাচ্ছিলেন। বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং রাষ্ট্রপতির প্রোটকল অফিসারকে দেখা গেল বারবার ইশারা করে তাদের উঠে দাঁড়াতে বলছেন। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করেছে, প্রকাশ্যেই বহুবার ঘোষণা দিয়েছে ক্ষমতায় গেলেই জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীত বদলে ফেলবে, তারা জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা, বঙ্গবন্ধু, ৭ই মার্চ ইত্যাদি মীমাংসিত বিষয়কে অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে এটাই স্বাভাবিক।

এই ঘটনায় অনেকেই বেশ আশ্চর্য হয়েছেন হয়েছেন বলে মনে হলো। যে সংসদ চিহ্নিত সত্তর জন রাজাকার আলবদর ও যুদ্ধপরাধী সমৃদ্ধ এবং আরও যথেষ্ট সংখ্যক ছুপা রাজাকার পরিবেষ্টিত, সেই সংসদে এখনো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে সেটাই অনেক বেশি। আমাদের কথিত 'জুলাই বিপ্লব' এর অংশীদার অনেককেই এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে আহাজারি করতে দেখে বলতেই হয়, 'আপনারা বাস্তবতা মেনে নিন। তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার-এর স্লোগানে সুর মিলিয়ে এখন আবার ...আমার সোনার বাংলা... শুনতে চাইলে তো চলবে না।' মাকাল ফলের গাছ লাগিয়ে আপনারা মনে হয় আপেলের আশা করছেন। জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে মনে প্রাণে পাকিস্তানে বিশ্বাসীরা যে পাকসার জমিন সাদ বাদ... গাইবার আবদার করবে না তা কে বলতে পারে! আমি স্মৃতি হাতড়ে দেখলাম পাকসার জমিন থেকে শুরু করে... সায়ায়ে খোদায়ে জুল জালাল পর্যন্ত পুরো পাকিস্তানি জাতীয় সঙ্গীত এখনো মুখস্ত আছে। একাত্তর সালে একবার পাকিস্তান আর্মির সামনে পড়ে যেমন দ্রুত সুরা ফাতেহা মুখস্ত বলে বেঁচে গিয়েছিলাম, ভবিষ্যতে হয়তো পাকসার জমিন সাদ বাদ... বলে জীবন বাঁচাতে হতে পারে।

দেশের খবর

SIR ষড়যন্ত্র নিপাত যাক

মোসারেকুল আনোয়ার

SIR যে আসলে ভোটার তালিকা সংশোধনের কোন ন্যায্য প্রক্রিয়া নয়, এটা এতোদিনে মানুষের কাছে পরিষ্কার। এটাও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, এই SIR এর নামে নির্বাচন কমিশন ও ইউনিয়ন সরকার বেছে বেছে মূলতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটারদের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলার এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। SIR-এ হিয়ারিং নোটিশ যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষ, যারা এরাজ্যের জনসংখ্যার কমবেশি ৩০ শতাংশ। আর Adjudication এর আওতায় যে প্রায় ৬০ লাখ ভোটারের ভাগ্য ঝুলে থাকলো, সেই তালিকা থেকে স্পষ্ট তাঁর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মুসলিম ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত। শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮০ থেকে ৯০ শতাংশ) পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র সুজাপুর, সামসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা ও ভগবানগোলা দেখলেই বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয়না। এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে Adjudication এর আওতায় আছেন প্রায় ৪৩ থেকে ৫৩ শতাংশ মানুষ।

এই বিপুল সংখ্যক নাগরিক তথা ভোটারকে বাদ রেখেই হয়তো আগামী নির্বাচন সংঘটিত হয়ে যাবে, যার ষড়যন্ত্র চলছে এখন। সমস্ত ভোটারই বৈধ এবং এই বিরাট সংখ্যক ভোটারকে বাদ রেখে নির্বাচন যে আসলে নির্বাচনের নামে প্রহসন - এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই প্রক্রিয়াকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটাধিকার হরণের প্রশ্ন হিসেবে নয়, সার্বিকভাবে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্হাকে ধংস করার সাথে বিবেচনা করতে হবে। এমতাবস্থায় আপনি প্রতিবাদ করবেন, পথে নামবেন সে পথও বন্ধ।

বন্দুক হাতে দুয়ারে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন আমরা এই SIR এর তথা Logical Discrepancy-র বিরোধিতা করছি সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

প্রথম এবং প্রধান বিরোধের কারণ হল, "The Representation of the People Act– 1950" এর ধারা ১৩/B– ১৩/C, ১৩/CC বা ধারা ২১, ২২, ২৩ অনুযায়ী কেবলমাত্র ERO বা AERO-দেরকেই ভোটারের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে বা The Registration of Electores Rule, ১৯৬০ বা অন্য কোন আইনে Micro Observer বা Roll observer এর কোন বিধান নেই বা ভোটারের যোগ্যতা নির্ধারণে তাদের কোন ভূমিকা নেই। অথচ Under Adjudication এর আওতায় যে বড় সংখ্যক ভোটারের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, সেটা কেবল এই Observer দের আপত্তি বা খবরদারির কারণে। এক্ষেত্রে ERO বা AERO-দের সিদ্ধান্ত মানা হয়নি এবং নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে সেগুলোকে অমীমাংসিত বলে আটকে রাখা হয়েছে। নিরপেক্ষ ভোটার লিস্ট তৈরিতে এই হস্তক্ষেপ বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবেই চিহ্নিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ এই SIRএ প্রত্যেক ভোটারকে ২০০২ সালের তালিকার সাথে ম্যাচিং দেখাতে হবে নিজের বা Progeny (বংশধর)-র সাথে। এই ম্যাচিং দেখানোর আইনগত ভিত্তি কি এবং সেটাও আবার নির্দিষ্ট করে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সাথেই কেন? তাহলে ২০০২ সালের আগের বা পরের একাধিক তালিকায় যাদের নাম আছে এবং বিভিন্ন নির্বাচনে নিয়মিত ভোট দিয়ে এসেছেন সেই তালিকাগুলো কি অবৈধ? অথচ সেই তালিকাও তো তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশনই। আর সেই সব তালিকা যদি অবৈধ হয় তবে সেই তালিকার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত সরকার কিভাবে বৈধ হয়?

তৃতীয়তঃ লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যানসির যে চারটি ক্যাটাগরিতে ভোটারদের হিয়ারিং-এ ডাকা হয়েছে তার জন্য কি কোন মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়? তার কি কোন আইনি ভিত্তি আছে? নাম বা পদবীর ভুল একটি সাধারণ ত্রুটি যা আইনতঃ সংশোধনযোগ্য চলমান প্রক্রিয়া।

এছাড়া চার, ছয় বা তারও অধিক সন্তান কি ভারতীয় আইন অনুযায়ী অবৈধ?

পূর্বপুরুষের সাথে বয়সের যুক্তিগ্রাহ্য তফাৎ না হওয়া কি আমাদের দেশে খুব অস্বাভাবিক ঘটনা? কেননা আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি সামাজিক সমস্যা, যা আমাদের দেশের প্রায় সব ধর্মেই একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

আর মাত্র ২০/২৫ বছর আগেও গ্রামাঞ্চল তো বটেই শহর এলাকাতেও জন্ম সার্টিফিকেটের তেমন বাধ্যবাধকতা বা চল ছিলনা। তাই সরকারি নথীতে মানুষের বয়স একটা আন্দাজ করে নথীভুক্ত করা হতো। তাই বয়সের এই অস্বাভাবিকতা আমাদের দেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আর এই সব ভুল বা ত্রুটির জন্য একজন মানুষ নাগরিক নয় - এটা প্রমাণ হয়না।

তাছাড়া এই লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যানসির খাঁড়া বিহার বা অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে তো দেখা যায়নি। তবে কোন যুক্তিতে কেবল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে লাগু করা হচ্ছে এমত মনগড়া বিধান?

চতুর্থতঃ ভোটারের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য যে যে নথি চাওয়া হয়েছে সেসব নথি কি লেখাপড়া না জানা কোটি কোটি মানুষদের কাছে থাকার কথা? ঐতিহাসিকভাবে এবং বাস্তবিক কারণেই আদিবাসী, পাহাড়ি জনজাতি, মতুয়া সম্প্রদায় সহ ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষ, বিশেষ করে যারা গত ২০০২ সালের পরে এদেশে এসেছেন, ফুটপাতবাসি মানুষ, ভাঙ্গন বা অন্য কারণে গৃহহীন মানুষ, পিতামাতার সাথে সম্পর্কহীন মানুষ (যেমন বিভিন্ন রেড-লাইট এলাকাতে কাজ করা মহিলারা) - তাদের তো এই সকল নথিপত্র থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

পঞ্চমতঃ কোন অধিকারে নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্বের আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করে ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাইকে ভিত্তি ধরে, নিজের বা পিতামাতার এদেশে জন্মের প্রমাণপত্র চাইছেন? এটা কি ঘুরপথে নাগরিকত্ব যাচাই করা হচ্ছে না? নাগরিকত্ব যাচাই তো নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ। এর আগে ১৯৫১ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে, যা কখনো অনুসরণ করা হয়নি।

ষষ্ঠতঃ SIRএর সমস্ত প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ভীষণ লুকোচুরি ও সন্দেহজনকভাবে। কোন স্বচ্ছতা নেই সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডে। এক এক সময়ে একেকরকম নির্দেশ এসেছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। তাদের নিজেদের পূর্বেকার নির্দেশ পরবর্তীতে অমান্য করা হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে। যেমন প্রথম ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, যারা ২০০২ সালের সাথে ম্যাচিং দেখাতে পারবেন তাদের আর অন্য কোন প্রমাণ বা নথী দেখাতে হবে না। অথচ তাদের Logical Discrepancy-র অজুহাতে ডেকে হয়রান করা হয়েছে একাধিকবার। Domicile Certificate– Family Register বা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত আবাস বা পাট্টার অনুমোদনপত্র নির্বাচন কমিশন দ্বারা ঘোষিত ১১ খানা নথির তালিকার মধ্যে থাকলেও, তা শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়েছে।

বিহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাতিল ভোটারের কারণ-সহ সম্পূর্ণ তালিকা নির্বাচন কমিশন নিজে থেকে দিতে চায়নি। শেষে সুপ্রিম কোর্ট-র আদেশে এই তালিকা আদায় করতে হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মেশিন-রিডেবল তালিকা তারা দিতে চায়নি। এটাও কোর্টের কাছে গিয়ে আদায় করতে হয়েছে। এভাবে গোটা প্রক্রিয়াটি লুকোচুরি ও অস্বচ্ছতায় মোড়া। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে যা একেবারে মাত্রাছাড়া। যেমন কতজন আবেদনকারী ফর্ম -৬ পূরণ করে নূতনভাবে সংযোজনের আবেদন করেছিলেন বা কত সংখ্যক ফর্ম -৭ আবেদনপত্র জমা পড়েছে, সেটা আবেদন করার শেষ দিন বা কোন পর্বেই জানানো হয়নি। ফর্ম-৬ এবং ফর্ম -৭ এর সংখ্যা নিয়ে নির্দিষ্ট জালিয়াতির অভিযোগে তো রয়েছেই। এছাড়াও আইন অনুযায়ী ফর্ম -৭ দাখিল করে বাতিলের আবেদন করবেন তার সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ ঠিকানা জানাতে হবে ফর্মে এবং এই বাতিলের এবং অভিযোগ প্রমাণের দায় সেই অভিযোগকারীর উপরেই বর্তায়। সেই সকল নিয়ম মানা হয়নি বরং যোগ্যতা প্রমাণের দায় ভোটারের উপরেই চাপানো হয়েছে।

আর একটি বিষয় খুব আফসোস ও দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বা ভরসার জায়গা যে বিচার বিভাগ তার ভূমিকাও কিন্তু ভীষণ হতাশাজনক। সম্পূর্ণ SIR প্রক্রিয়াটি এতটা অসাংবিধানিক, আইন-বহির্ভূত, অ-যৌক্তিক, সাম্প্রদায়িক এবং অস্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও বিচার বিভাগ সমস্ত অভিযোগ একরকম উপেক্ষা করে চলেছেন। দেশের কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকারের মতো একটি প্রাথমিক ও বুনিয়াদি নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে তথাপি বিচার বিভাগ এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে ছাড়পত্র দিচ্ছে। শুধু ছাড়পত্র দেওয়া নয় আসলে বিচার ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের সেফটি ভালভের কাজ করছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

আরও একটি বিষয় খুব বিস্ময়কর লাগছে এবং ভীষণ নাড়া দিচ্ছে - সেটা হল শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হিন্দু' জনগোষ্ঠীর মানুষের অদ্ভুত নীরবতা! লাখ লাখ সহনাগরিক যখন তার নাগরিক অধিকার রক্ষায় শঙ্কিত, আতঙ্কিত; তখন তাদের মধ্যে যেন কোন উদ্বেগ নেই, তাদের যেন কিছু যায় আসেনা এতে। এটা তো ক্ষ্মওদেরক্ষ্ম সমস্যা এই ভাবেই হয়তো ভাবছেন। আসলে তাদেরকে তো এভাবেই গেলানো হচ্ছে যে, এরা তো অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা। এরাই তো তোমাদের হক লুটে খাচ্ছে, এরাই দেশের সব সমস্যার কারণ। তাই SIR এর মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বিতাড়ন করা হবে। আচ্ছা আপনারা আপনাদের চারপাশে এই অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা মানুষদের কেউ কখনো দেখেছেন বা চেনেন? আপনার যে চেনা প্রতিবেশী ইতিপূর্বে বছরের পর বছর ভোট দিয়ে এসেছেন, আপনার মতো পাশের বাড়িতে বা পাশের পাড়ায় বসবাস করছেন, হঠাৎ এরা কাগজ দেখাতে পারছেন না বলে অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা হয়ে গেল কি করে? যে কাগজ(আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড) ৯৮ শতাংশ মানুষের কাছে আছে সেটা গ্রহণ না করে যে কাগজ অধিকাংশ মানুষের কাছে নেই সেটা চাওয়ার মধ্যে দিয়ে কি এদের বিদেশী বানানোর চক্রান্ত চলছে বলে মনে হচ্ছে না আপনাদের?

এর উদ্দেশ্য তো ভোটার তালিকা সংশোধন নয় বরং দেশের দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী মুসলমান সমেত আদিবাসী, মতুয়া, পাহাড়ি জনজাতি, ফুটপাতবাসী, নিরক্ষর মানুষ, পিতামাতার সাথে সম্পর্কহীন মানুষকে তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত। আচ্ছা আমরা কি জানিনা ওপার বাংলা থেকে কারা দলে দলে এদেশে চলে আসছেন? ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষের ৯৮ শতাংশই তো হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ - এটা আমরা যারা বর্ডার এলাকায় বসবাস করি তারা সবাই ভালোই জানি।

তবুও বিজেপির অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি কিভাবে? বিজেপির এই প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছি যে, দেশের সম্পদ এই অনুপ্রবেশকারীরা লুটেপুটে খাচ্ছে। আসলে যাদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তারাও আপনার মতো এই দেশটা গড়ে তোলার কারিগর, দেশটা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সৈনিক। তারাও আপনার মতো সমান এই দেশটার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। ইতিহাস কিন্তু সেই সাক্ষীই দেয়। বরং এই দেশের প্রায় অর্ধেক সম্পদ লুটে যে এক শতাংশ লুঠেরা (শিল্পপতিরা) নিরানব্বই শতাংশ মানুষের পেটে লাথি মারছে এটা না বুঝে যাদের (মুসলমান) কাছে দেশের সম্পদের এক শতাংশও নেই তাদের শত্রু ভাবছেন। এতে তো আপনার কোন লাভ নেই বন্ধু, উল্টে আপনি শত্রু চিনতে ভুল করে নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করছেন। এই ইউনিয়ন সরকারের উদ্দেশ্য আপনার কোন ভালো করা নয় বরং আপনাকে বিভ্রান্ত করে এই এক শতাংশ সুবিধাভোগীর রাস্তা কণ্টকমুক্ত করা - এটা বোঝার চেষ্টা করুন।

আপনার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চাকরিবাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা ভালো থাকা নির্ভর করছে কতখানি এই এক শতাংশ সুবিধাভোগী লুটেরাদের লুঠ আটকাতে পারেন তার উপর। আপনার প্রতিবেশী দরিদ্র, নিরন্ন হা-ভাতে মুসলমান বা আদিবাসী সহনাগরিকের উপর

নয়। রাজনীতির কারবারিরা নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ব্যাক্তিগত লাভে দাবার ঘুঁটি করছে এটা বোঝার সময় এসেছে।

পরিশেষে এই দাবি করছি—

১) এই অসাংবিধানিক, বে-আইনি, বৈষম্যমূলক ও অস্বচ্ছ SIR বাতিল করা হোক।

২) ৬০ লাখের অধিক নির্বাচককে বাইরে রেখে নির্বাচন একটি প্রহসন। এই প্রহসন বন্ধ করে SIR-পূর্ব ২০২৫ সালের শেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।

৩) এই বে-আইনি ও চক্রান্তমূলক SIR এর মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র হত্যাকারী নির্বাচন কমিশনারকে অবিলম্বে অপসারণ করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৪) BLO সহ ১৪৫ জন মানুষের মৃত্যুর দায় এবং কোটি কোটি মানুষকে SIR-র নামে হয়রানির দায় নির্বাচন কমিশন ও ইউনিয়ন সরকারকে নিতে হবে।

৫) ফর্ম -৭ এর ভিত্তিতে যে সকল ভোট বাতিল করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং এই চক্রান্তের সাথে যুক্ত অভিযোগকারী ও আধিকারিকের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

(সরলরেখা পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

সোনম ওয়াংচুক মামলা : সুপ্রিম কোর্টের শুনানির আগে জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার

প্রতাপ সাহারান

ভারতে একজন সৎ নাগরিকের সবচেয়ে বড় অপরাধ কি এখন নিজের মানুষের অধিকারের জন্য কথা বলা?

লাদাখের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষক, পরিবেশবাদী কর্মী এবং রমন ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী সোনম ওয়াংচুকের সাথে যা ঘটেছে, তা কেবল একজন ব্যক্তির প্রতি অবিচার নয়। এটি আমাদের সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন তোলে যা বজায় রাখার দাবি আমরা গর্বের সাথে করি, যেখানে আইনের শাসন সর্বাগ্রে থাকার কথা।

সরকার সোনম ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA)-এর অধীনে গ্রেপ্তার করেছিল, যা দেশের অন্যতম কঠোর নিবর্তনমূলক আটক আইন এবং তাকে প্রায় ১৭০ দিন জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। এটি সেই একই আইন যা সাধারণত সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত সহিংসতা বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি বলে বিবেচিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো–

সরকারকে তার নিজস্ব নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে লাদাখের অধিকার দাবি করা কি সত্যিই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে?

ভিডিওর ভিত্তিতে 'দেশবিরোধী' তকমা সরকারি সংস্থা এবং তাদের সমর্থক প্রচারযন্ত্র দাবি করেছিল যে, সোনম ওয়াংচুকের ওপর এনএসএ (NSA) আরোপের ভিত্তি ছিল কিছু ভিডিও ক্লিপ। সেই ক্লিপগুলো ব্যবহার করে দেশের একজন সম্মানিত নাগরিককে এমনকি 'পাকিস্তান ও চীনের এজেন্ট' হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছিল।

যাইহোক, ওয়াংচুকের আইনি দল আদালতে যুক্তি দিয়েছিল যে, এই ভিডিওগুলো সম্পাদনা করা (Edited), কাটছাঁট করা এবং প্রসঙ্গের বাইরে উপস্থাপন করা হয়েছে।যদি এই দাবি সত্য হয়, তবে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। ভুল তথ্যের মাধ্যমে একজন নাগরিকের সম্মান নষ্ট করা কি এখন শাসক গোষ্ঠীর নতুন রাজনৈতিক কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে?

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেঃ্ম পুরো ভিডিও দেখান ! মামলাটি যখন ভারতের সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়, তখন আদালত জানিয়েছিলেন যে ওয়াংচুককে আটকে রাখার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ ভিডিও রেকর্ডিংগুলো তারা পরীক্ষা করে দেখবেন। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ নির্দেশ দেন যে বিচারকরা নিজেরাই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং ১৭ মার্চ চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য করেন।

এর অর্থ হলো, প্রথমবারের মতো বিচার বিভাগ সরাসরি সেই তথ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করতে যাচ্ছিল যার ওপর ভিত্তি করে সরকারের পুরো বয়ান তৈরি করা হয়েছিল। আর ঠিক সেখানেই গল্পের মোড় হঠাৎ ঘুরে গেল এবং তারপর, হঠাৎ ১৪ মার্চ এনএসএ প্রত্যাহার করা হলো শুনানির মাত্র কয়েকদিন আগে, সরকার আকস্মিকভাবে ঘোষণা করে যে সোনম ওয়াংচুকের ওপর আরোপিত এনএসএ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হয়েছে, যার ফলে তিনি মুক্তি পান। লাদাখের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবির সাথে সম্পর্কিত প্রতিবাদের কারণে প্রায় ছয় মাস নিবর্তনমূলক আটকে থাকার পর এই সিদ্ধান্ত আসে।

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে—

যদি গ্রেপ্তারটি যুক্তিসঙ্গত ছিল, তবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগে এটি প্রত্যাহারের এমন তাড়া কেন ছিল?

সরকার কি ভয় পেয়েছিল যে আদালতে পুরো ভিডিওগুলো চালানো হলে দেশ শেষ পর্যন্ত আসল প্রেক্ষাপট দেখে ফেলবে?

বিচার বিভাগীয় তদন্তে কি এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল যা ফাঁস করে দিত যে, যে ভিত্তির ওপর একজন নাগরিককে মাসের পর মাস কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তা প্রশ্নবিদ্ধ? জেলে কাটানো ১৭০ দিনের জবাব কে দেবে? ধরে নিলাম সরকার এখন এনএসএ প্রত্যাহার করছে। কিন্তু তাতে কি ১৭০ দিনের কারাবাস মুছে যায়?

সোনম ওয়াংচুকের সম্মানের যে ক্ষতি হয়েছে তা কি পূরণ হবে?

যেসব মিডিয়া চ্যানেল এবং রাজনৈতিক প্রচার মাধ্যম তাঁকে 'দেশবিরোধী' তকমা দিয়েছিল, তাদের কি জবাবদিহি করতে হবে?

প্রথমত কেন এমন কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা দিতে কি কোনো কর্মকর্তাকে বলা হবে? নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতায় এটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে?

আসল হুমকি কে?

যদি একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং সামাজিক কর্মীকে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে কারারুদ্ধ করা যায়, তবে আসল প্রশ্ন হলো—

আসল হুমকি আসলে কে?

সোনম ওয়াংচুক ; নাকি এমন একটি ব্যবস্থা যা ভিন্নমতকে ক্রমেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে?

আজ এই প্রশ্নটি কেবল ওয়াংচুককে নিয়ে নয়। এটি সেই প্রতিটি নাগরিককে নিয়ে যারা গণতন্ত্রে আওয়াজ তোলার সাহস দেখায়।

কারণ যদি সত্য কথা বলাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা শুরু হয়, তবে গণতন্ত্র এবং ভয়ের মধ্যে অর্থবহ পার্থক্য আর কী থাকে?

অগ্নিবিধ্বস্ত দণ্ডকারণ্যের বাঙালি উদ্বাস্তুদের ওপর ঘৃণ্য আক্রমণ

ডা. সুবোধ বিশ্বাস, সভাপতি নিখিল ভারত বাঙালি সমন্বয় সমিতি

'নিখিল ভারত বাঙালি সমন্বয় সমিতির' পক্ষ থেকে আমরা প্রতিনিধি মণ্ডলী মালকানগিরির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি এবং অগ্নি বিধ্বস্ত গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল—

ফিরে দেখা —

ষাটের দশকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশভাগের বলি উদ্বাস্তু বাঙালিদের দণ্ডকারণ্যের মালকানগিরি জেলায় ২১৩টি গ্রামে পুনর্বাসন দেয়। হিংস্র জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যের মাঝে তাঁদের শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই। বিনা চিকিৎসা, খাদ্য ও পানীয় জলের সংকটে অকালে ঝরে গেছে অগণিত প্রাণ। তাঁদের খবর কেউ রাখেনি। আজও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র জীবজন্তুর আতঙ্কে দিন কাটছে তাদের। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি হারাবার ভয় তাঁদের বিব্রত করে তোলে। তার উপরে নতুন অস্তিত্বের সংকট তাদের বিব্রত করে তুলেছে।

ঘটনার সূত্রপাত

প্রত্যক্ষদর্শী ২৬ নম্বরের গ্রামের প্রধান মহানন্দ বৈরাগী বলেন, '১লা ডিসেম্বর ২০২৫ মালকানগিরি ২৬ নম্বর উদ্বাস্তু বাঙালি গ্রামের প্রতিবেশী ৫০ বছরের লাকেপড়িয়ামি আদিবাসী বিধবা মহিলা নিখোঁজ হন। ৭ দিন পরে সেই মহিলার মুণ্ডহীন দেহ জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়। মৃত মহিলার জমি ২৬ নম্বর গ্রামের সুখরঞ্জন মণ্ডল বর্গা চাষবাস করত। এই ঘটনার পিছে তাকেই আদিবাসীরা সন্দেহ করে এবং চার-পাঁচ হাজার দুষ্কৃতিকারী ৭ই ডিসেম্বর ২০২৫ এম ভি ২৬ নম্বর উদ্বাস্তু বাঙালি গ্রামে আক্রমণ চালায় এবং ১২টা বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এবং পরের দিন বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েক হাজার দুষ্কৃতিকারী বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও বর্বরতা চালায়।'

ক্ষুধার তাড়না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও সুরক্ষার সংকট এবং হাড়কাঁপানো শীতে সর্বস্ব হারিয়ে আমরা অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী। এখন চরম অন্ন ও বস্ত্রের সংকটের মধ্যে দিনযাপন করছি। বিস্ময়ের কথা মালকানগির জেলা মুখ্যালয় থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব মাত্র ২৫ কিলোমিটার। প্রশাসন চাইলে এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

শ্রীমতী শেফালী মণ্ডল বলেন, ক্ষ্মস্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা আমাদের কাঁচা বাড়িগুলি কেরোসিন ও ডিজেল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লুটপাট করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। ব্যবহৃত সমস্ত রকমের বাহন জ্বালিয়ে দেয়। গৃহপালিত গবাদি পশু নিয়ে যায়। ৬০ বছরের কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্জিত বিষয়-সম্পত্তি লুট করে নেয়। এমনকি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও শ্রী হরি মন্দির পুড়িয়ে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। জমির দলিল, ব্যাংকের পাস বুক, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, সহ শিশুদের পুস্তক ও পোশাক সমস্ত রকমের ডকুমেন্টস পুড়ে ধুলোয় মিশে যায়।'

শ্রী অরুন হালদার বলেন, 'ঘটনা স্থলে ৬০ জন পুলিশ মোতায়েন ছিল। পুলিশ আমাদের বলে তোমরা গা ঢাকা দাও। জীবন বাঁচাও। আমরা তোমাদের ঘরবাড়ি রক্ষা করব। পুলিশ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দুষ্কৃতিকারীরা এই বর্বরতা চালায়।'

১৯৬৪ সালে এই গ্রামে আমার বাবার পুনর্বাসন হয়। এইখানেই আমার জন্ম। ৭ ডিসেম্বর প্রথম দিনে কয়েক হাজার দুষ্কৃতিকারী তীর ধনুক হাসুয়া কুড়াল আর আধুনিক আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে গ্রামে আক্রমণ চালায়। তারা আমার ঘরে ঢুকতে চায়। আমি প্রতিরোধ করি। তারা ঘরে ঢুকতে পারেনি। ৮ ডিসেম্বর আবার তারা দলবদ্ধভাবে গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা গ্রামে না থাকলে অনেক অনেক নিরপরাধ মানুষ মারা যেত। তারা প্রতিনিয়ত গ্রামে এসে হুমকি দিচ্ছে। এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার ফতোয়া জারি করেছে। আমরা এখানে থাকতে পারবো না। রাতে ভয়ে ঘুমাতে পারিনা। ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?'

সুধীর মণ্ডল, শ্রীমতী সুমিত্রা মণ্ডল এবং সুকুমার সরকার বলেন, 'ওরা দূর দূর থেকে গোলাবারুদ নিয়ে এসেছিল। পাকা বাড়ির মাঝে জিলেটিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ডিনামাইট বোম ব্লাস্ট করে। সমস্ত বাড়িগুলো ভেঙে গেছে। আসবাবপত্র কিছুই নেই। পুলিশের কথামতো আমরা ৭ তারিখে এক কাপড়ে ঘর থেকে প্রাণ বাঁচাতে বেরিয়ে আত্মীয়-স্বজনের ঘরে আশ্রয় নেই। ৭ দিন পরে গ্রামে ফিরে দেখি কিছুই নেই। পোড়াবাড়ি আর ধুলোবালি পড়ে আছে। আমরা ভীতসন্ত্রস্ত। সরকার আমাদের ১০ দিন সকালে বিকালে খিচুড়ি খেতে দিয়েছিল। কলার পাতায় আমরা খোলা আকাশের নিচে বসে খেয়েছি। প্রশাসন একটা কম্বল, একটা গামলা, একটা বালতি, একটা মগ এবং একটা তৃপল দিয়েছে। আর কিছুই দেয়নি। বিজেপির এমপি এমএলএ কে আমরা নির্বাচিত করেছি। তারা কেউ মুখ খুলছেন না। আমাদের পাশে কেউ নেই।'

জীবন কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, 'আমার বয়স ষাট বছর। আমার জন্ম এই গ্রামে। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার আমাদের পুনর্বাসন দিয়েছে। অথচ আমাদের ঘুষখোর, পেটি বাংলাদেশি বলে। আমাদের সবকিছু পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে স্থানীয়রা এসে ধমকি দেয়। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার ধমকি দেয়। সরকার কোনও রকমের সহমর্মিতা দেখাচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে এখানে থাকতে পারবো না।'

ঘটনার ১৫ দিনের পরে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করে, এবং তারা জামিন পেয়ে যায়। তারাই এখন গ্রাম ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে।

সুনীল বাবু বলেন, '২২৫টা বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। লেপ, কাঁথা, কম্বল, ধান, চাউল, হাঁড়ি পাতিল, হাতা খুন্তি কিছুই নেই। শুধু অগ্নিবাষ্পভূত ধূলিকণা, জরাজীর্ণ ভগ্নস্তুপ পড়ে আছে। প্রশাসন কিছুই দেয়নি। কালেক্টর প্রতি পরিবারকে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। ২০ দিন গত হল, এখনও আমরা কোনও আর্থিক অনুদান সরকারের কাছ থেকে পাইনি। সরকার কোনও সহমর্মিতা দেখাচ্ছে না। যদি এই ঘটনা কোনও আদিবাসী গ্রামে ঘটতো, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘটনাস্থলে যেতেন। অনুদানের পাহাড় জমে যেত। আমাদের অপরাধ আমরা বাঙালি। আমাদের মধ্যে কোন নির্বাচিত বাঙালি বিধায়ক বা সাংসদ নেই। সে আমাদের হয়ে সংসদে কথা উত্থাপন করবে। স্থানীয় উড়িয়া ভাষী বিজেপি দলের বিধায়ক ও সাংসদ তাদের আমরা দুহাত ভরে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছি। তাদের আমরা পাশে পাচ্ছি না। আমরা ৪০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি সরকারের কাছে করেছি। সরকার ' ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার ঘোষণা করেছেন। ' এখনও আমরা হাতে কিছুই পাইনি। এই সংকটের মুহূর্তে নিখিল ভারত বাঙালি সমন্বয় সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি ডা সুবোধ বিশ্বাসের আহবানে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান, কর্ণাটক, উড়িষ্যার রায়গর এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৫০ লক্ষ টাকার খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছেন। আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিখিল ভারত সমিতির বিভিন্ন রাজ্যের নেতা নেত্রী এসেছেন। তাদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।'

ডা সুবোধ বিশ্বাস বলেন, 'এই জাতীয় অমানবিক ঘটনা ঘটলে, সেই সময় আমরা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এবং বিভিন্ন ধর্মী ও সামাজিক সংগঠনকে পাশে দাঁড়াতে দেখেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মালকানগিরির অসহায় মানুষের পাশে তাদের আমরা পাইনি। এই কঠিন পরিস্থিতির সময় যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব সমাজের পাশে দাঁড়াবেন, ন্যায় বিচার দেবেন, তাদের মুখে বাঙালি-বিদ্বেষ মূলক বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করেছে। নেতাদের বক্তব্যের কিছু অংশ— এরা রাজনৈতিক ভোটের অংক কষে ' উদ্বাস্তু বাঙালিদের বাংলাদেশী 'তকমা লাগিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। প্রভাবশালীদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রচার মাধ্যম ঘটনা কে বিকৃত করে

পরিবেশন করছে। স্থানীয় সংখ্যাগুরুদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে আরো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সব থেকে বড় কথা, ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে হয়তো আপনারা বানিয়ে নেবেন। কিন্তু যে আত্মশক্তি হারিয়েছেন, সে আত্মশক্তি টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক সমর্থন পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের ছিল না। সেজন্য বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন । পূর্ব বাংলার ঘটনার এখানে যদি পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তাহলে আমরা বাঙালি সংখ্যালঘু মানুষ এখান থেকেও বিলুপ্ত হব।

'নিখিল ভারত বাঙালি সমন্বয় সমিতির' ১৭টা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় গৃহ মন্ত্রী, মহামহীম রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মানবাধিকার সংঘ কে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি।

যতদিন আপনারা ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ না পাচ্ছেন, আপনাদের হয়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। আপনারা স্থানীয় আদিবাসী ভাই বোনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এবং মালকানগিরি বাঙালি সমিতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বাঙালি সমিতির কর্ণধার গৌরাঙ্গ সরকার, ডা. গোপাল বিশ্বাস, উত্তম ওঝা সহ সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

মুখ্যমন্ত্রীর বকেয়া ডি. এ. দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও কনফেডারেশনের বিবৃতি

শেষ পর্যন্ত মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গত ৫ ই ফেব্রুয়ারি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে 'রোপা--২০০৯' অনুসারে এপ্রিল--২০০৮ থেকে ডিসেম্বর--২০১৯ পর্যন্ত এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে বকেয়া ডি.এ./ডি.আর. দেওয়ার ঘোষনা করতে বাধ্য হয়েছেন? বস্তুত গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই রায় কার্যকর প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন রাজ্য সরকারগ্ধাত ২০ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ রা মার্চ দিল্লিতে মাননীয়া ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সঙ্গে দিল্লিতে এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ও অর্থ সচিব বৈঠক করে রায় কার্যকর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই রায় কার্যকর করতে যে রাজ্য সরকার বাধ্য হবেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তাই রাজ্য সরকার বা মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না। তিনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য হয়েছেন মাত্র,রাজ্যকর্মীদের প্রতি কোন সদিচ্ছার প্রদর্শন করেন নি। পূর্বতন অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত 'রোপা-২০০৯' এ সুনির্দিষ্ট ভাবে এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে ডি.এ./ডি.আর. দেওয়ার সংস্থান রেখে গিয়েছিলেন বলেই আমরা মামলা করতে পেরেছি। আজ 'জয়' পেয়েছি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাহ। কিন্তু 'রোপা-২০১৯' এ রাজ্য সরকার ডি.এ./ডি.আর. শব্দটাই রাখেন নি। 'রোপা-২০০৯' এর বকেয়া ডি.এ./ডি.আর. আমরা পেতে চলেছি আদালতের নির্দেশে। এর সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক নেই। কিন্তু 'রোপা-২০১৯' এ 'এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে ডি.এ/ডি.আর. দেওয়ার সংস্থান'রাখার এবং বকেয়া ৪০% ডি.এ./ডি.আর. দেওয়ার দাবিতে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমরা এবং শাসক দল সমর্থক বাদে সমস্ত কর্মী সংগঠন আন্দোলন করে চলেছি,সেই দাবিতে এখনো সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারিনি। যতদিন পর্যন্ত না এই দাবি পূরনে সরকারকে বাধ্য করতে পারছি ,ততদিন কোন উচ্ছাস/ আনন্দ প্রদর্শন নয়,আন্দোলন জারি রাখতে হবে।

সবশেষে কর্মী সমাজকে এই 'জয়' উৎসর্গ করলাম।

— শ্যামল কুমার মিত্র, সভাপতি, কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ,প.বঙ্গ.,মূল মামলাকারি সংগঠন।

গণমাধ্যম

আপনি কি আগামী আড়াই মাস দূরদর্শনে (টিভি) সংবাদ দেখা বন্ধ রাখতে পারেন না?

রভিশকুমার

সাহসী ও আদর্শবাদী সাংবাদিক রভিশকুমার জনসাধারণের কাছে এক আবেদনে বলেছেন ,যদি নিজেদের নাগরিক বোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, টিভিতে খবর দেখা বন্ধ করুন। তাঁর সম্পূর্ণ আবেদনটির বঙ্গানুবাদ নিচে রাখা হল।

যদি গণতান্ত্রিক ভারতের একজন সচেতন, দায়িত্ববান নাগরিক হন তাহলে টিভিতে খবর দেখা বন্ধ করুন। যদি নিজের সন্তানদের সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদ থেকে বাঁচাতে চান, টিভিতে খবর দেখবেন না। যদি ভারতের সাংবাদিকতাকে রক্ষা করতে চান, টিভির খবর বর্জন করুন। টিভিতে খবর দেখা হল নিজের পতন নিজের চোখে দেখার

সমতুল্য। আমি সমস্ত দর্শকদের কাছে অনুরোধ করছি, টিভিতে সম্প্রসারিত খবর বর্জন করুন, টিভির সমস্ত নিউজ চ্যানেল বা সংবাদপ্রচারকারী চ্যানেলগুলিকে অন্তত আড়াই মাসের জন্য বর্জন করুন। টিভি বা মোবাইল, সর্বত্রই খবরের চ্যানেল বা খবরের সাইটকে এড়িয়ে যান। নিজের রোজকার অভ্যাসের তালিকা থেকে টিভিতে খবর শোনা বাদ দিন। যদি তাতে আমার অনুষ্ঠান দেখাও বন্ধ করেন, আমি ক্ষুন্ন হব না, কিন্তু দয়া করে টিভির সংবাদপ্রচারকারী চ্যানেলের থেকে দূরে থাকুন। আমি অনেকদিন ধরেই এটা বলছি। জানি এই নিত্যদিনের বিভ্রম থেকে বেড়িয়ে আসা আপনার জন্য সহজ হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে আগামী আড়াই মাসে টিভিতে খবর না দেখার আর্জি জানাচ্ছি। টিভির মাধ্যমে আপনাদের সামনে সংবাদের নামে পরিবেশিত হচ্ছে হিস্টিরিয়া ও উন্মাদনা। এই রকম যে প্রথমবার হচ্ছে তা নয়। এই হিস্টিরিয়া ও উন্মাদনা সৃষ্টি করা, টিভির সংবাদমাধ্যমগুলির এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতেই পরিণত হয়েছে। যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন সক্রিয় উত্তেজনা থাকে না তখন উত্তেজনা তৈরি করতে এই চ্যানেলগুলি মন্দির ইস্যু নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে। আবার মন্দির ইস্যু যখন উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে না, তখন পদ্মাবতীর মত সিনেমাকেই উপলক্ষ করে এরা উত্তেজনার পারদ চড়ায়। আর কোন বিতর্কিত সিনেমার অভাবে, কাইরানার মত ঘটনাকে ঘিরে মিথ্যা ও সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ প্রচার হাওয়া হয়ে ওঠে এদের উত্তেজনা সৃষ্টির হাতিয়ার, হিন্দু, মুসলিম বিদ্বেষ তৈরি করে এরা উত্তেজনার মহল বজায় রাখে। আর এরকম কোন ইস্যুও যদি না পাওয়া যায় তখন এদের উপজীব্য হয় অগণিত তথাকথিত সার্ভে বা সমীক্ষা, যার কোনই সারবত্তা নেই। আপনি কি উপলব্ধি করতে পারেন কেন এরকমটা হচ্ছে? নাগরিক হিসেবে কোনদিন কি নিজেদেরকে দেখেছেন এই সব চ্যানেলের খবরের বিষয় হয়ে উঠতে? জনগণের ইস্যু এইসব চ্যানেল থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই ইস্যুগুলিকে ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে। এখন চ্যানেলই ঠিক করে দেয় আপনারা কি নিয়ে ভাববেন, চিন্তা করবেন। এটা বিশেষ কোন গোপন তথ্য নয় যে আপনারা এটা জানেন না। মানুষ পীড়িত ও বিভ্রান্ত। তারা এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে নিজেদের সমস্যার খবর খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু কোথাও সেই খবর নেই। আজকের যুব সম্প্রদায় যে সমস্যায় জর্জরিত কোন সংবাদমাধ্যমে তার ঠাঁই হয় না। বরং চ্যানেলগুলি তাদের দৃষ্টি অপ্রাসঙ্গিক ইস্যুতে সরিয়ে দিয়ে, তাদের বোকা বানায়। আপনার বোঝা দরকার কি ভাবে এই অপ্রাসঙ্গিক ইস্যুগুলি আজ টিভির পর্দা জুড়ে হাজির। এই সমস্ত চ্যানেলের সৃষ্ট উত্তেজনা ইচ্ছাকৃত ভাবে একজন নেতার সুবিধার্থে সৃষ্ট, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংবাদমাধ্যম, সরকার, বিজেপি ও মোদী সবাই একে অপরের সাথে যুক্ত। এই সংযোগ এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যে সাধারণ দর্শকের বুঝে ওঠা মুশকিল কোন খবর সত্যি আর কোন খবর মিথ্যা অপপ্রচার। আপনি কোন নেতাকে পছন্দ করেন, এটা স্বাভাবিক, এমনকি বলা যায় দরকারিও। কিন্তু আপনার পছন্দের দুর্ব্যবহার করে চ্যানেলগুলি যা করে চলেছে তা বিপদজনক। বিজেপির সমর্থকদেরও সঠিক সংবাদ জানা প্রয়োজন। সরকার ও মোদী ভক্তির নামে তাদের সামনে মিথ্যা পরিবেশন, এক অর্থে তাদের অপমান করা। তাদের মূর্খ ভাবা। তাদের বোকা বানানো, কারণ তারা ঐ পরিবেশিত খবরের উপর ভিত্তি করেই তাদের পছন্দ অপছন্দ নির্ণয় করেন। কাজেই টিভির সংবাদমাধ্যম এইভাবে শুধু আমজনতাকেই অপমান করছে না, তারা বিজেপি সমর্থকদেরও রেহাই দিচ্ছে না। সুতরাং বিজেপি সমর্থকদের কাছেও আমার আর্জি টিভিতে খবর দেখবেন না। গণতন্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞে শরিক হবেন না। চ্যানেলের এই উন্মাদনায় না মাতলে কি আপনি মোদী সমর্থক হতে পারেন না? নরেন্দ্র মোদীর সমর্থক হওয়ার জন্য কি সাংবাদিকতার বলিদান আবশ্যিক? যদি তাই মনে করেন, তাহলে বলব, আপনি একজন সৎ সমর্থক নন। সংবাদমাধ্যমের গরিমা অক্ষুন্ন রেখে কি নরেন্দ্র মোদীর সমর্থক হওয়া অসম্ভব? বিজেপির সমর্থক আপনারা। আপনারা বিজেপিকে নির্বাচন করেছেন, সমর্থন করেছেন, এই চ্যানেলগুলিকে নয়। সংবাদমাধ্যমের পতন শেষ পর্যন্ত রাজনীতির পতন ডেকে আনে আর সেই সাথে পতন হয় একজন সৎ সমর্থকেরও। আজ চ্যানেল থেকে আপনার নাগরিক অধিকারের উপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে। গণতন্ত্রে একজন নাগরিক হয়ে ওঠা সহজ না। কোন এক দেশে জন্মানোর সূত্রেই সেই দেশের দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে ওঠা যায় না। সঠিক খবর ও তার ভিত্তিতে করা সঠিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েই আপনি একজন নাগরিক হয়ে ওঠেন। আজকের টিভির সংবাদমাধ্যম না দেয় সঠিক তথ্য, না করে সঠিক প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী মোদী, সাংবাদিকতার এই দুর্দশার একজন মুখ্য রূপকার। তিনি এই পতনের কর্ণধার বলা যায়। চ্যানেলগুলি তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের আতিশয্যতে জো হুজুরে পরিণত। তারা তো নিজেদের সমর্পণ করেইছে, এখন আপনাকেও এক চাটুকারে পরিণত করতে চাইছে। আপনি চাটুকার হয়ে গেলে গণতন্ত্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যে টানাপড়েন চলছে, তার সুযোগ নিয়ে, চ্যানেলেরা নিজেদের দেশভক্তি জাহির করতে ব্যস্ত। আদতেই এদের কাছে দেশের জন্য কোনও ভক্তি নেই। যদি ভক্তি থাকতো তাহলে গণতন্ত্রের চতুর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সাংবাদিকতাকে

তারা সমৃদ্ধ করত, তার রক্ষা করত। চ্যানেলের মাধ্যমে যে ভারতের ছবি আপনাদের সামনে উপস্থিত করা হয় ও সেটাকে অবলম্বন করে আপনাদের মনে যে ভারতের চিত্র তৈরি করা হয়েছে, সেটা আমাদের ভারত নয়। সেটা এক নকল ভারত। আসল দেশপ্রেম হল নিজেদের কাজকে নিষ্ঠা ও আদর্শের সাথে করে চলা। অথচ চ্যানেলের স্পর্ধা দেখুন, মিথ্যা তথ্য, সারবত্তাহীন বিশ্লেষণ তথা শ্লোগানের জোরে, তারা আপনার দেশভক্তি গঠনের চেষ্টা করে চলছে। আপনার মনের স্বাভাবিক দেশভক্তির স্রোতকে নষ্ট করে, এই চ্যানেলগুলি কৃত্রিম দেশভক্তির বন্যা বইয়ে দিতে চাইছে। যাতে আপনি এক যান্ত্রিক রোবটে পরিণত হন। বর্তমানের সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম আপনার নাগরিক অধিকারের সর্বনাশ করে চলেছে। এতদিনে আপনাদের বোঝা উচিৎ এই বিপর্যয় ঘটতে আর বাকি নেই। এই বিপর্যয় ঘটে গেছে। সংবাদপত্রের হালও সংবাদমাধ্যমেরই মত। বিশেষ করে হিন্দি সংবাদপত্র যেন পাঠকদের সর্বনাশের ঠিকা নিয়ে ফেলেছে। ভুল ও আধা অসম্পূর্ণ খবর প্রতিনিয়ত পরিবেশন করে, তারা ধারাবাহিক ভাবে পাঠকদের হত্যাই করে চলেছে বলা যায়। সংবাদপত্রের পাতা ভালো করে উলটে দেখুন। রদ্দি ছাড়া কিচ্ছু না। আপনার খবর কাগজওয়ালাকে নিশ্চিন্তে বলে দিন, দাদা ইলেকশানের পরে আবার খবর কাগজ দেবেন, এখন বন্ধ থাক কিছু মাস। এই সরকার চায় না আপনি একজন সচেতন ও যোগ্য নাগরিক হন। টিভি চ্যানেল তো আমজনতার মনে বিপক্ষ হয়ে ওঠার ক্ষমতাই শেষ করে দিয়েছে তাদের নিরন্তর অপপ্রচারের মাধ্যমে। আর আপনি যদি (সরকারের) বিপক্ষের মত ভাবতে না পারেন, তাহলে সরকারের একজন শক্তপোক্ত সমর্থকও কোনদিন হয়ে উঠতে পারবেন না। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে কোন সরকারকে সমর্থন করা আর সজ্ঞানে, বিচার বিবেচনা করে কোন সরকারকে সমর্থন করা, দুটি ভিন্ন জিনিস। প্রথমটা আপনার অপমানের পরিচয় আর দ্বিতীয়টা আপনার আত্মমর্যাদার। আপনি কি টিভির সংবাদ চ্যানেল দেখে নিজেকে আরো অপমানিত করতে চান? সরকারকে সমর্থন করতে চান?

আমি জানি আমার এই কথা কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছাবেনা, তারা টিভির সংবাদ দেখা বন্ধও করবেন না। কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই। এই যদি আজকের ভারতের সাংবাদিকতার স্বরূপ হয়, তাহলে দেশে আসন্নকালে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। টিভি চ্যানেলগুলি এমন এক জনতা তৈরি করছে যাদের বিচারধারা ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই জনতাকে দিয়ে তারা সেই আমজনতাকে পরাস্ত করবে যাদের মনে রয়েছে প্রশ্ন করার ইচ্ছা, রয়েছে সঠিক খবর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তথ্য ও প্রশ্ন ছাড়া গণতন্ত্র হয় না, নাগরিকতাবোধের অস্তিত্ব থাকে না।

সত্য ও তথ্য আজ টিভির সংবাদমাধ্যম থেকে উধাও। আমি দেখি প্রতিদিন জনতাকে এক অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি এক বিষম ঘূর্ণাবর্তে টিভি চ্যানেল জনতাকে আবদ্ধ রাখতে চায়। রাজনৈতিক দলেদের তৈরি করা ইস্যু ছাড়া আজ আর অন্য কোন বিষয়ে চর্চার অবকাশ নেই। অথচ কত আলোচ্য বিষয়ই আমাদের চারধারে অপেক্ষমাণ। টিভির খবরের চ্যানেলের প্রভাবে প্রভাবিত মানুষদের আসলে আমজনতার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই চ্যানেলগুলির রমরমা আসলে আপনার পরাজয়ের করুণ দৃশ্য। আপনার গোলামিতেই এদের জয়। এই চ্যানেলের প্রভাবমুক্ত হওয়া সহজ নয়। আপনি একজন দর্শক। আপনি একজন নেতাকে সমর্থন করার জন্য সাংবাদিকতার পতনকে সমর্থন করবেন না। স্রেফ আড়াই মাসের ব্যাপার। টিভিতে সংবাদপ্রচারকারী চ্যানেল দেখা বন্ধ করে দিন।

মূল হিন্দি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন উজ্জয়িনী হালিম।

প্রকাশিত হল সাংবাদিক সুকুমার মিত্রর বই; ‘শিরোনামের আড়ালে : তদন্তমূলক সাংবাদিকতা’।

কৃষানু মজুমদার

আমাদের মনের মানুষ সুকুমার দা।

ডাকাবুকো এক সাংবাদিক। ভয়ডর তাঁর অভিধানে ছিল না। জীবনের তোয়াক্কা না করেই নেমে পড়ত মাঠে। পিঠে কিংবা বুকে গুলি লাগতে পারে, এই আশঙ্কা তাঁকে কখনও থামাতে পারেনি। খবরের খোঁজে সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামে পড়ে থাকতে দেখেছি। সেই সিঙ্গুর, সেই নন্দীগ্রাম;যে আন্দোলন একসময় রাজ্য রাজনীতিকে তোলপাড় করে দিয়েছিল।

সেই উত্তাল সময়েই নবজাতক দৈনিক স্টেটসম্যান কাগজকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল একা সুকুমারদা। আজ যে সুনাম ও মর্যাদা কাগজের শরীরে জড়িয়ে রয়েছে, তার নেপথ্যে সুকুমার মিত্রর শ্রম, সাহস আর নিষ্ঠার অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের চিফ রিপোর্টার শ্রদ্ধেয় আশিস ঘোষ একদিন কপালে গভীর ভাঁজ ফেলে বলছিলেন, 'সুকুমারের সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নন্দীগ্রামে এখন অপারেশন চলছে। ছেলেটা যে কী করছে, ভীষণ চিন্তায় আছি।'

আজ, ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম দিবসের দিনেই প্রকাশ পেল তাঁর বই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর দেবপ্রিয় মল্লিক, নাট্যকার অরূপশংকর মৈত্র, ডক্টর কল্যাণ রুদ্র এবং অধ্যাপক নবীনানন্দ সেন।

তাঁদের বক্তব্যে উঠে এল সেই সময়ের গা শিউরে ওঠা সব কাহিনি;যা ইতিহাসের বইয়ে নেই, কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়েই রয়ে গিয়েছে।

আমি ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। ম্যাচ রিপোর্ট লিখতে গিয়ে প্রায়ই বলি, 'তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে।'

সাংবাদিকতা পেশাতেও সুকুমারদার ছায়া ঠিক তেমনই, ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে।

আজ অনেক তরুণ-তরুণী সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। তাদের কথা ভাবলে মাঝে মাঝে মনে হয়, ওরা তো মাঠে দাঁড়িয়ে সুকুমারদার রিপোর্টিং দেখার সুযোগই পেল না।

তারা দেখেনি এক নির্ভীক সাংবাদিকের ছুটে চলা। দেখেনি এক ভিন্ন জীবনদর্শনের মানুষকে, যার জীবনবোধ মানুষকে আকর্ষণ করে, অনুপ্রাণিত করে।

আগামীদিনেও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন নিয়ে লেখা হবে বহু প্রবন্ধ, বহু বই, বহু খবর। কিন্তু সুকুমার মিত্রর এই বই; 'শিরোনামের আড়ালে'; হয়ে থাকবে এক অনিবার্য রেফারেন্স।

এই বই শুধু তদন্তমূলক সাংবাদিকতার দলিল নয়, এক সাহসী সাংবাদিকের জীবনদর্শনেরও আখ্যান।

আপনজনের কথা

'কাকু, আমি কিন্তু মুসলমান', ফোনের ওপারে কাতর কণ্ঠস্বর

চন্দ্রপ্রকাশ সরকার

ছেলে গৌরাঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে তার মা বাড়িভাড়া খুঁজতে খুঁজতে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। ছেলে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। শান্তশিষ্ট, নিরীহ, নির্বিবাদী ছেলেকে তার মা কলেজ-হোস্টেলে রাখতে চান না। রগ্গাগিংয়ের ভয়।

— 'শুনলাম আপনাদের নাকি ঘর খালি আছে?' শহুরে শিক্ষিতা মাঝবয়সী স্মার্ট মহিলা জিজ্ঞেস করেন।

— 'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ঘর অবশ্য খালি আছে। কিন্তু আমরা তো ফ্যামিলি ছাড়া ভাড়া দিই না!' কেন ফ্যামিলি ছাড়া ঘরভাড়া দিই না তার কিছু ব্যাখ্যাও দিলাম।

সব শুনেটুনে উনি হাসিমুখে বললেন, 'ছেলের সাথে আমিও থাকব। তার মানে ফ্যামিলিই হয়ে গেল!'

ঘর দেখানো হলো। পছন্দ হয়ে গেল। ভাড়া বলা হলো। তাতেও রাজি হয়ে গেলেন। সবশেষে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত গলায় বললেন, 'আরেকটা কথা বলার ছিল! আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমাদের সাথে ছেলের একজন বন্ধুও থাকবে। ওরা দুজন একসাথে ভর্তি হয়েছে। আমরা উঠেছিও একই হোটেলে। আমরা মা-ছেলে থাকবো একটা ঘরে, আরেকটা ঘরে সে থাকবে।'

বুঝলাম ভাড়ার ভার অর্ধেকটা লাঘব হবে, আর দুই বন্ধু পারস্পরিক বোঝাপড়া করে পড়াশোনা করলে ওদের পক্ষে ভালো হবে— এই তার অভিপ্রায়। বললাম, 'থাকবেন তো আপনারা, আমাদের আর আপত্তির কী আছে!'

এবারে আরও কুণ্ঠিত কণ্ঠের দ্বিধান্বিত উত্তর, 'না মানে, ছেলেটা মুসলিম তো তাই!'

আজ ২১ শতকে দাঁড়িয়েও এসব কথা শুনতে হচ্ছে সেই জন্য খানিকটা ব্যথাহত হলেও ওদেরকে তা বুঝতে না দিয়ে সোজাসাপ্টা বললাম, 'না না, আমার কাছে ওসব ব্যাপারই না! আপনারা এখানেই থাকবেন। স্বচ্ছন্দে থাকবেন।'

ওরা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। আমাদের চেনা বহরমপুর ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। এই শহরের সাথে একদিন কাজী নজরুল ইসলামের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি দিনের পর দিন থেকেছেন শশাঙ্ক শেখর সান্যাল ও নলিনাক্ষ সান্যালদের বাড়িতে। থেকেছেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা সহ এই শহরে মুসলিম সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং নেতাজি রাতের পর রাত কাটিয়েছেন হিন্দু বাড়িতে। এই শহরেই ডা.অজয় ঠাকুরের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে ভাড়া ছিলেন শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের সুপরিচিত নেতা এম সিরাজ। সিরাজের স্ত্রী প্রতিমা দাস জন্মসূত্রে হিন্দু কন্যা। সিরাজ-কন্যা তানিয়ার রেজিস্ট্রি বিয়েতে কন্যা পক্ষের সাক্ষী ছিলেন অজয়বাবু। সিরাজ সাহেব নিজের বাড়ি করে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর সেই বাড়িতে বহু বছর ভাড়া থেকেছেন অধুনা প্রয়াত

সাংবাদিক অনল আবেদীন। ডা.অজয় ঠাকুরের নাকি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল! তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় কোনরকম সংকীর্ণতা ছিল না। এই শহরে এখনো বেশ কিছু হিন্দু নারী মুসলিম পরিবারে এবং মুসলিম নারী হিন্দু পরিবারে সসম্মানে ঘরসংসার করছেন। অধ্যাপক রাজন গাঙ্গুলীর জীবনসাথী একজন মুসলিম কন্যা। হিন্দু কন্যা গোপার সাথে ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে সাংবাদিক শুভাশিস সৈয়দের। বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিলেন শহরের সুপরিচিত কবি সাহিত্যিকরা। এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বিশিষ্ট কবি ও লেখক সৈয়দ খালেদ নৌমান আশাবরী আবাসনে থাকেন, তিনি বাদে বাকি আবাসিকরা সবাই হিন্দু। একই অবস্থা অন্য একটি ফ্ল্যাটেও। সেখানে সপরিবারে থাকেন এই জেলার বর্ষীয়ান বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক খাজিম আহমেদ। খাজিম সাহেবের স্ত্রী হিন্দু কন্যা এবং জামাই হিন্দু সন্তান। এসব নিয়ে বহরমপুর শহরে কোনরকম আলোচনা সমালোচনা ছিল না। ছিল না কারো কোন মাথাব্যথা। কিন্তু এখন, তথাকথিত লাভ জিহাদের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর, অনেকেরই মাথার মধ্যে জাতের ভূত ঢুকে পড়েছে। হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য আলাদা আলাদা ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। নির্মাণকারী প্রোমোটার হয়তো মুসলিম, অথবা হিন্দু-মুসলিম মিলেই একটি কোম্পানি খুলেছেন। অথচ ফ্ল্যাট বুকিংয়ের সময় শুনতে হচ্ছে-- 'এই ফ্ল্যাট মুসলিমদের জন্য নয়।'সারা রাজ্য তথা সারা দেশজুড়েই এই অবস্থা! এইরকম এক সামগ্রিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণেই ভদ্রমহিলা ছেলের মুসলিম বন্ধু বাসিরকে থাকতে দেওয়া হবে কিনা এই সংশয়ে ভুগছিলেন।

বাসির এবং গৌরাঙ্গ -- দুটি নামই পরিবর্তিত। একজনের বাড়ি উত্তরের রায়গঞ্জ, আরেকজনের রাজ্যের রাজধানীতে। দুজনেই ভালো ছাত্র। যথানিয়মে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কাউন্সেলিংয়ের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাসিরের বাড়িতে মা, বাবা ও বোন আছে। বাবা স্কুল শিক্ষক, মা-ও সরকারি কর্মী। বোন ছাত্রী। গৌরাঙ্গদের পরিবারও তদ্রুপ, 'হাম দো হামারা দো।' বাবা ছোটখাটো ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ। বোন ছাত্রী। অতিরিক্ত স্টুডিয়াস এবং ভীষণ অন্তর্মুখীন ছেলে গৌরাঙ্গকে তার মা সব সময় চোখে চোখে রাখেন। রঙ্গ্যাগিংয়ের ভয়ে কলেজের হোস্টেল পাওয়ার চেষ্টাই করেননি। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে এসেছেন। আপাতত কলেজের নিকটবর্তী একটি আবাসিক হোটেলে উঠেছেন। বাসিরও সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ওই একই হোটেলে উঠেছে। দুজনের কাছেই নতুন জায়গা। একই কলেজ, একই ক্লাস, একই হোটেল। স্বাভাবিকভাবেই সমবয়সী দুই তরুণের মধ্যে ভাব হয়ে যায়। ওরা একসাথে থাকতে চায়।

বাসিরের 'আন্টি'(গৌরাঙ্গর মা) আমার সম্পর্কে সব কথা ওকে খুলে বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাদের ঘরে ঢোকার কয়েকদিন আগে সংশয়ি বাসির একদিন ফোন করে কাতর কণ্ঠে বলেছিল, —'কাকু, আমি কিন্তু মুসলমান!'

বছর চারেক আগের এই কথাটা এখনো আমাকে ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত করে।

নাগরিক স্মৃতিচারণা

যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও সাধনা ঔষধালয়

বাংলাদেশ থেকে লিয়াকত হোসেন খোকন

যোগেশচন্দ্র ঘোষ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত সাধনা ঔষধালয়ের নাম একসময় দুই বাংলার মানুষের মনে সজীব ছিল।

আমাদের পিরোজপুরের সদর রাস্তায় আছে একটি ব্রিজ, সেই ব্রিজের কাছাকাছি ছিল সাধনা ঔষধালয় - এর একটি শাখা। সাধনা ঔষধালয় নিয়ে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৬০ এর দশকে ১৯৬৬ -১৯৬৭ সালে সাধনা ঔষধালয়ে যেতাম মাসিক 'ঝিনুক' পুস্তিকাটি আনতে। একজন মধ্যবয়স্ক দাদার কাছ থেকে 'ঝিনুক' কিনতাম। সিনেমার ছবি, সিনেমার খবরাখবর, চিত্রতারকাদের জীবনী, নাট্যজগতের খবর সহ উপন্যাস ও গল্প এবং বিচিত্র ধরনের নিউজ থাকত ঝিনুক পুস্তিকাটিতে। এক টাকা চার আনা দাম ছিল ১৯৬৭ সালে। মধ্য বয়স্ক সেই দাদা একটু মোটাসোটা লম্বা ধরনের ছিলেন, তাঁর নাম এখন আর স্মরণে আসছে না। স্বাধীনতার পর পর সেই দাদাকে দেখেছিলাম কয়েকবার। একটা সময়ে সাধনা ঔষধালয়ে আড্ডা দিতেন পিরোজপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । সেই দিন আজ নেই! কয়েক দিন আগে পিরোজপুরে গিয়ে দেখলাম, সাধনা ঔষধালয় বন্ধ। কথায় কথায় এক ভদ্রলোক জানালেন, 'পিরোজপুরে সাধনা ঔষধালয় আর থাকছে না। বেচাকেনা নেই বলে সাধনা ঔষধালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'সাধনা ঔষধালয় ' ১৯১৪ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। এরই কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯১৮ সালের দিকে পিরোজপুরেও প্রতিষ্ঠিত হয় সাধনা ঔষধালয়।

যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হল 'সাধনা ঔষধালয়।' ঢাকার গেন্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রথম আয়ুর্বেদিক পরীক্ষাগার হিসেবে

পরিচিত। এর উৎপাদিত বিভিন্ন ভেষজ ওষুধ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটির ওষুধ শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, এক সময় চীন ও উত্তর আমেরিকাতেও তাদের উৎপাদিত ওষুধ ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮৮৭ সালে শরীয়তপুরের গোঁসাইরহাট গ্রামে। ১৯০২ সালে তিনি ঢাকার কে এল জুবিলী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯০৪ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। এর পর ১৯০৬ সালে কুচবিহার কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন।তিনি ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ভাগলপুর কলেজে ও ১৯১২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭-১৯৪৮ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যোগেশচন্দ্র লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি-র ফেলো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সাধনা ঔষধালয়ের সদর দফতরে নিজ কার্যালয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে তিনি শহিদ হন।

যোগেশচন্দ্র ঘোষের বোনের মেয়ে হলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্ত। অনেকেরই হয়তো মনে থাকার কথা গীতা দত্তের গাওয়া - মেরা সুন্দর সপনা বীত গয়া (দো ভাই-১৯৪৭), ও সপনেবালি রাত (পেয়ার - ১৯৫০), তদবির সে বিগড়ি হুয়ি তকদির (বাজি - ১৯৫১), আন মিলো আন মিলো (দেবদাস - ১৯৫৫), নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে (পৃথিবী আমারে চায়, ১৯৫৭), তুমি যে আমার (হারানো সুর ১৯৫৮ সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), ওগো সুন্দর জানো নাকি (ইন্দ্রানী ১৯৫৮), এই মায়াবী তিথি (সোনার হরিণ ১৯৫৯), তোমার দুটি চোখে (সোনার হরিণ ১৯৫৯), এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় (হসপিটাল ১৯৬০), আমি শুনেছি তোমারি গান (স্বরলিপি১৯৬১), আমি নতুন স্বপন দেখি (স্বরলিপি ১৯৬১), জাদু ভরা ঐ বাঁশি (সাথীহারা ১৯৬১), বাঁশি বুঝি সেই সুরে (সাথীহারা ১৯৬১) ইত্যাদি গানগুলির কথা। কেউ কেউ বোধহয় এ গানগুলি গুনগুন করে গেয়েও থাকেন। গীতা দত্ত ১৯৩০ সালের ২৩ নভেম্বর তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার ইদিলপুরের একটি ধনী জমিদার পরিবারে (বর্তমান বাংলাদেশের শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট) জন্মগ্রহণ করেন। পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্তের সাথে বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল গীতা ঘোষ রায়চৌধুরী। বিয়ের আগে গীতা রায় নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বাবা মার সাথে বোম্বের দাদারে একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে আরম্ভ করেন।

সেদিন পিরোজপুরে গিয়ে বারেবারে চোখের পাতায় ভেসে উঠেছিল সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর ভাগ্নী গীতা দত্তের প্রতিচ্ছবি। একদা পিরোজপুরের সদর রাস্তার পাশে সেই সাধনা ঔষধালয়ে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা আড্ডা দিতেন, গল্পগুজবে মাতোয়ারা হতেন..... আহা সেই দিনগুলি আর ফিরে আসবে না!

স্মরণ

সমুদ্র দত্ত

'শ্রমজীবী ভাষা' পত্রিকার সম্পাদক

শ্রমিক তথা মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের রুটি রুজির লড়াইয়ে দীর্ঘদিনের অবিচল সাথী সমুদ্র দত্ত, যিনি বাবু দত্ত নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, হঠাৎ করেই ৮ মার্চ ২০২৬ চিরবিদায় নিলেন সবার কাছ থেকে ৬৮ বছর বয়সে। যাদবপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। পশ্চিমবাংলার বুকে বড্ড প্রয়োজনীয় সময়ে ঘটলো তাঁর এই প্রস্থান! অনেক ছোটবেলা থেকেই বাবু দত্ত যুক্ত হয় নক্সালবাড়ি ধারার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। বিভিন্ন সময়ে সিপিআই (এম-এল) দলের নানা অংশের সঙ্গেই ছিলো তাঁর সাংগঠনিক যোগ। সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই তিনি সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। সময়ের সাথেসাথে, নানারকম মতপার্থক্যের কারণে সেইসব যোগাযোগ ক্রমেই শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিলো ধারাবাহিক। কখনও বেলেঘাটার কাঠকলে; কখনও হয়তো তপসিয়া-তিলজলা অঞ্চলে ট্যানারি শিল্পে; কখনও গড়িয়ার মহামায়াতলায় বয়লার কারখানায়; আবার কখনও বানতলায় লেদার ট্যানারি কমপ্লেক্সে। সরাসরি তাঁর নেতৃত্বে, প্রায় দশহাজার ট্যানারি শ্রমিকদের কলকাতায় পথ-অবরোধ, শ্রমিক আন্দোলনের এক মাইলফলক হয়ে আছে। জাতি-জাত-ধর্ম নির্বিশেষে, শ্রমিক তথা শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য ছিলো তাঁর সবসময়ের লক্ষ্য। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক অবস্থান যা-ই হোক, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিলো নিয়মিত ও আত্মিক সম্পর্ক। কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিকসংগ্রামে ছিলো তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি।

২০০৫ সাল থেকে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। প্রথমে 'শ্রমজীবী' নাম দিয়ে; পরে তার নাম হয় 'শ্রমজীবী দেশ'; সবশেষে

পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায় 'শ্রমজীবী ভাষা' নামে। তিনি যখন হাসপাতালের আইসিইউ-তে শেষ শয্যায়, তখনও প্রেসে থাকা মার্চ মাসের সর্বশেষ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস সংখ্যা' নিয়ে জানতে চেয়েছেন ঘোরের মধ্যে, মৃত্যুর আগের দিন। সমুদ্র দত্ত শুধুই শ্রমজীবী ভাষা নিয়ে বেঁচে ছিলেন।

বাবু দত্ত মানেই ছিলো শ্রমজীবী ভাষা; পুঁজির আনুকূল্য ছাড়া , বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর না করে 'শ্রমজীবী ভাষা' নিরন্তর পথ চলেছে দৃঢ়ভাবে। সব বাধাকে অতিক্রম করে। পত্রিকার আর্থিক টানাটানির সময়ে, মায়ের পেনশনের টাকা মাসের পর মাস পুরোটাই ঢেলেছেন পত্রিকার জন্য। তাঁর ঘোষিত বিশ্বাস ছিলো, 'ভালো কাজ টাকার জন্য আটকে থাকে না।দ এইরকম আর একটা বাবু দত্ত কোথায় পাওয়া যাবে! নজির সৃষ্টিকারী এই পত্রিকা সর্বদা ঠিক সময়ে প্রকাশ করা ছিল তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ। ভালো লেখা প্রকাশ করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করতেন।বার বার লেখকদের তাগাদা দিতেন। বর্তমান কালের অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, প্রগতিশীল শিবির থেকে অনেকে সরকারি উচ্ছিষ্টের লোভে, নিজেদের মেরুদন্ড বিকিয়ে দিয়ে দক্ষিণপন্থী শিবিরে ভিড়ে যাবার প্রবণতা! শ্রমজীবী ভাষা ছিল এই স্তাবকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী ভাষা ছিল নিরলস প্রচারক।

সমুদ্র দত্ত, অনেকের বাবু বা বাবুদার এই প্রয়াণে শ্রমিক শ্রেণি, সমাজ ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হল। 'নাগরিক' এর সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

পরিবেশ

আমি চাই গাছ কাটা হলে শোকসভা হবে বিধানসভায়

অপর্ণা চক্রবর্তী

খড়দহের কল্যাণনগরে এক টুকরো লালমাটির গন্ধ মেখে দাঁড়িয়ে ছিল পলাশ গাছটা। প্রতি বসন্তে ফুলের আগুন লাগিয়ে লাল হয়ে উঠতো। কল্যাণ মঞ্চের পুকুর পাড়ে মৌটুসীরা ভিড় জমাতো। সেই গাছটা দিনে দুপুরে খুন হয়েছে।

প্রতি বসন্তেই পলাশ কুড়ানোর লোভে হানা দিই ওই পথে। কদিন আগেও গিয়েছিলাম, তখনও শীতের আবেশ কাটেনি, পলাশের কুড়ি ফুটে ফুল হয়নি তখনও। মাঝে আর যাওয়া হয়নি, আজ বিকেলে ভাবলাম ফুল কুড়িয়ে আনি! পৌঁছে হতভম্ব হয়ে গেলাম! গাছটি আর নেই। গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে! পাড়ার লোককে দেখিনি, সবার দুয়ার আটা। পথ চলতি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জানালেন পাড়াতেই থাকেন, অথচ নিজেই অবাক হয়ে গেলেন! পাড়ায় থেকেই জানেন না এই হত্যালীলার কথা ! কখন, কে বা কারা কেন এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন জানি না ! একটা এতো বড় গাছকে কেটে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পক্ষে কি কোনো যুক্তি থাকতে পারে ? ? ?

আমরা সব দেখেও চুপ করে থাকবো ? বন্ধু বিয়োগের যন্ত্রণা হবে না? গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও বলতে খুব মজা, গাছ কাটা দেখে প্রতিবাদ করার সময় নিজের পিঠ বাঁচাবো ? খড়দার বুকে আর কোনো পলাশ গাছ আছে কিনা জানা নেই। প্রতিবাদ করতেই হবে, নইলে ওই পুকুরের ধারে থাকা অন্য বৃক্ষদেরও একই পরিণতি হবে! যারা গাছ কাটলেন, লড়াইটা তাদের জন্যও, পৃথিবীতে প্রাণ বায়ু ফুরিয়ে আসছে, পরিবেশপ্রেমীদের লড়াইটা ওই গাছ কাটা লোকেদের এবং তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যও। কল্যাণনগরে পলাশ গাছ অন্তর্ধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই। কেউ সাথী হতে চাইলে কমেন্ট করুন।

ধারাবাহিক ইতিহাস

কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

কংগ্রেস সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক

১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কংগ্রেস দলের চরিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিতর্ক চলতেই থাকে। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি আপাতত স্থগিত রাখলেও এই পথটি বর্জন করার সিদ্ধান্ত হয়নি। সংসদীয় পথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পথটিই যে একমাত্র রাস্তা, এরকম কোনও সিদ্ধান্তেও পার্টি আসেনি। কংগ্রেস যে একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে একমত হলেও জওহরলাল নেহরুর

নেতৃত্বাধীন এই দল ও সরকার সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল নেহরু অনুসৃত নীতিসমূহ। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নেহরু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ যথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সাধারণভাবে তাঁর সরকার এই সময় এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার পরাধীন দেশগুলির চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানায়। কমিউনিস্ট নেতৃত্বধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক চিনকে স্বীকৃতি দেয়। সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে নিয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রধান স্থপতি ছিলেন নেহরু। এমনকী নেহরু, ১৯৫৩সালে চিন কর্তৃক তিব্বত অধিকার ও ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপকে সাধারণভাবে সমর্থন না করলেও চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রচারে গলা মেলাননি। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দিলেও নেহরু সরকার তাঁকে ভারতের অভ্যন্তরে কোনও চিনবিরোধী প্রচার না চালানোর জন্য বলে দেয়।

দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে রাজন্যবর্গ শাসিত দেশীয় রাজ্যসমূহকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে না, তাদের শত্রু দেশরূপে ঘোষণা করা হবে। আর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হয়। এই দুটি পদক্ষেপের ফলে সামন্ততন্ত্রের মূলে আঘাত করা হয়। যদিও জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনকে কঠোরভাবে বলবৎ করা ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শৈথিল্য চলতে থাকে। এর কারণ কংগ্রেস দলের মধ্যে বিরাট সংখ্যক সামন্তপ্রভুরা বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নেহরু বিশিষ্ট রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শ অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিকী ব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যোজনা কমিশন গঠিত হয়। গ্রামোন্নয়নের জন্য সারাদেশে সমষ্টি উন্নয়নের (Community Development) পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে তোলা হয়। যদিও তা ছিল মূলত প্রশাসন ও আমলা নির্ভর। কৃষির দ্রুত অগ্রগতি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একাধিক বৃহৎ নদী বাঁধ প্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমে ব্যাপক সেচ এলাকা বৃদ্ধি, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ শুরু করা হয়।

অপরদিকে মূল ও ভারী শিল্প নির্মাণে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইস্পাত, ভারী শিল্প, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। দুর্গাপুর ও রাউরকেল্লার কারখানা নির্মাণে এমনকী গ্রেট ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানির মতন ধনতান্ত্রিক দেশের সহায়তাও গ্রহণ করা হয়। অপর দিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজির বিকাশেও কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি ও বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহায়তাও দেওয়া হয়। একটি সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নেহরু অনুসৃত পন্থাগুলি নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। পার্টির মধ্যে অতি বামপন্থী ঝোঁকের প্রতিনিধিরা নেহরু অনুসৃত পন্থাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রয়াস বলে চিহ্নিত করেন। এই ঝোঁকের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ছিলেন বি টি রণদিভে, সুন্দরাইয়া ও বাসবপুন্নাইয়া। অপরদিকে একটি অংশ যার নেতৃত্বে ছিলেন পার্টির তৎকালীন সম্পাদক অজয় ঘোষ, এস এ ডাঙ্গে ও পিসি জোশি প্রমুখ। যাঁরা মনে করতেন ভারতের মতন সদ্য স্বাধীন দেশে বিকাশমান রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের একটি প্রগতিশীল ভূমিকা আছে জ্জ আমেরিকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের চরিত্রের মৌলিক পার্থক্যের কথা তাঁরা উল্লেখ করেন। দুই দেশের বুর্জোয়াদের ও রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্যের কথাও তাঁরা মনে করিয়ে দেন। তাঁরা বলেন, ভারতের বুর্জোয়াদের এক বড় অংশের একটি দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা আছে। এ বিষয়টিও তাঁরা উল্লেখ করেন যে বুর্জোয়াদের ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিকাশের তীব্র বিরোধিতা করছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু সরকারের ইতিবাচক দিকগুলিকে সমর্থন এবং একইসঙ্গে

জনগণের অধিকার ও দাবিসমূহ নিয়ে সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়। সংসদের অভ্যন্তরেও কমিউনিস্ট সদস্যরা জাতীয় ক্ষেত্রে মৌলিক প্রগতিশীল নীতিসমূহ গ্রহণ করার জন্য মতাদর্শগত প্রচার চালান। পার্টির গণভিত্তি প্রসারিত হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের নির্বাচনে সংসদে কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সহযোগী বামপন্থী দলের মিলিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩ ও ৩২ । পার্টির প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৭-তে দাঁড়ায় ৮.৯২ ভাগ ও ১৯৬২-তে তা দাঁড়ায় ৯.৯৪ ভাগ। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পার্টির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৫.২৯ ভাগ। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের নির্বাচনেও কংগ্রেস প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মতনই বিপুলভাবে জয়লাভ করে।হিন্দু মৌলবাদী পার্টি জনসংঘ, যার পিছনে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনেই বিপুলভাবে পরাস্ত হয়। তাদের শক্তি ছিল কমিউনিস্টদের থেকেও অনেক পিছনে। নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এই সময় পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনেই এই হিন্দু মৌলবাদী শক্তিকে দেশের পক্ষে প্রধান উপদ্রব

বলে প্রচার চালিয়েছিল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা সমাজতন্ত্রীরা (প্রজা সোশালিস্ট পার্টি ও সোশ্যালিস্ট পার্টিতে বিভক্ত) তাদের শক্তি অপরিবর্তিত রাখতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে কংগ্রেস প্রতিহত করায় সেই অবসরে কমিউনিস্ট পার্টি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। সাধারণ গরিব মানুষকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত করতে না পারায় কমিউনিস্টরা গরিব মানুষের শ্রেণিস্বার্থে সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিস্থিতির সুযোগ পায়। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কোনও নির্বাচনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করেনি। এই সময়ে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে 'কেরল' রাজ্যে কমিউনিস্টরা জয়লাভ করে ও দেশের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। ই.এম.এস নামবুদ্রিপাদ দেশের প্রথম কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী হন।কিন্তু এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রভাব সম্পন্ন চার্চ, নায়ার সম্প্রদায় ও সমাজবাদীরা বিমোচন আন্দোলন শুরু করে জ্জ এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে ওই আন্দোলনকে কেরল রাজ্যের কংগ্রেস সমর্থন করেন জ্জ পরিস্থিতি।এমন হয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সরকার চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।এস এ ডাঙ্গে পার্টির সভায় বলেন পার্টি ক্ষমতা ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে আর সরকার গড়ার দাবি করতে পারবে না। তাই পার্টি নেতৃত্ব পণ্ডিত নেহরুকে গিয়ে বলুন , কেন্দ্রীয় সরকার যেনো রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন।অবশেষে ওই অনুরোধ রক্ষা করে ১৯৫৯ সালে ওই রাজ্যের কমিউনিস্ট সরকারকে আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণ দেখিয়ে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। কংগ্রেস সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে সংসদে কমিউনিস্টরা আলোচনা উত্থাপন করেন। পার্টির পক্ষে এস এ ডাঙ্গে ক্ষুরধার ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য পেশ করেন। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তাঁর বক্তব্যে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি।তিনি বলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির একটি অর্ধ সত্য ' অশ্বত্থামা হত ইতি গর্জ' বলার জন্য তাঁর রথের চাকা মাটি স্পর্শ করেছিল। ভারতের দিকদর্শক প্রধানমন্ত্রী কেরালায় রাষ্ট্রপতি শাসন অনুমোদন করায় তাঁর রথের চাকাও ভূমি স্পর্শ করলো। নেহরুকে ডাঙ্গে দায়ী করলেও তিনি ডাঙ্গের বক্তব্যের কোনও প্রতিবাদ করেননি বা জবাব দেননি। যদিও তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শোনেন। (ক্রমশ)

জরুরী অবস্থা পরবর্তী পরিস্থিতি

সুশান্ত দাশগুপ্ত

(১৩)

অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদি আন্দোলন

অসমে গত শতকের আটের দশকে আসু ও অসম গণপরিষদের উত্থানকে ইন্দিরা গান্ধি শক্ত হাতে দমন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকে তিনি হিতেশ্বর সাইকিয়াকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসান। হিতেশ্বর সাইকিয়া অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ছিলেন এবং রাজ্যের প্রাক্তন আদর্শবাদী মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রকে কাজের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এই আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করে দেন।

অসমে একদা কমিউনিস্টদের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও আরসিপিআই (রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া) অসমের বেশ কিছু অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পার্টি বিভক্ত হওয়ার পরও সিপিআই নেতা ধীরেশ্বর কলিতা গুয়াহাটি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। শিলচর থেকে সিপিআই (এম) নেতা নুরুল হুদা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসু ও অসম গণ পরিষদের নেতৃত্বে যে 'বাঙালি বিদ্বেষী' আন্দোলন শুরু হয় তার বিরুদ্ধে কোনও দৃঢ় অবস্থান নিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ব্যর্থ হয়। উপরন্তু অগপ-র সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্ধ কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্টে অগপকে শরিক করার ফলে অসমে বামপন্থী দলগুলির গণভিত্তি ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর অসমেও জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল। প্রাক্তন সোশ্যালিস্ট গোলাপ বরবরা মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর সময়েই আসু-র উত্থান হয়েছিল। ১৯৮১- তে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রাক্তন সোশ্যালিস্টরাও অসমে তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধি নিহত হন।সে প্রসঙ্গে পরে আসবো।রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধি আসু ও গণ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে অসমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তার ফলে এদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এরা দুবার (১৯৮৫-১৯৯১ ও ১৯৯৬-২০০১) ক্ষমতায় এসেছিল। এছাড়া ১৯৯৬-১৯৯৮ এরা কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টের শরিক হয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। এদের দুবার অসমের শাসনকাল

সাধারণ মানুষের কাছে খুব সুখকর হয়নি। এবারের নির্বাচনে এই 'অগপ' অসমে ভারতীয় জনতা পার্টির জোটসঙ্গী হয়েছে। বর্তমানে অসমে অগপ একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। এদের গণভিত্তি হিন্দু মৌলবাদীরা কব্জা করে নিয়েছে। সেই ১৯৮৩ সালের নেলি-র দাঙ্গা বা তার আগে থেকেই আরএসএস সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। এতদিনে তারা তার ফললাভ করল।

পাঞ্জাব ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

স্বাধীনতা আন্দোলনে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। গদর পার্টির বিপ্লবীরা, ১৯১৫ সালের দ্বিতীয় সিপাহি বিদ্রোহের সৈনিকরা ও পরবর্তীকালে শহিদ ভগৎ সিংহের সহকর্মীরা দীর্ঘদিন যন্ত্রণাদায়ক কারা নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। অনেকের প্রাণদণ্ড হয়। এই বিপ্লবীদের বড় অংশ পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহ যথা পাতিয়ালা, মোগা, ফরিদকোট, কাপুরথালা, নাভা, মালের কোটলা প্রভৃতির রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এই সব দেশীয় রাজ্যের রাজারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের আশ্রিত ও তাদের সহযোগী। এই রাজ্যগুলিকে বলা হত পাঞ্জাব ও ইস্ট পাঞ্জাব স্টেটস ইউনিয়ন (পেপসু) এবং এই রাজ্যসমূহের প্রজাদের মধ্যে ছিল কমিউনিস্টদের শ্রদ্ধার আসন।

পাঞ্জাবের জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে কংগ্রেসেরও ছিল সুবিশাল প্রভাব। স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ছিল পরস্পরের পরিপূরক। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ সব সময়ই পাঞ্জাবের বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

পাঞ্জাবে ও অন্যত্র শিখদের উপাসনাস্থল তথা গুরুদ্বারগুলির পুরোহিতরা যাদের গ্রন্থি বলা হয় তারা বংশানুক্রমিকভাবে এই পদে নিযুক্ত হত। এই বংশানুক্রমিক পুরোহিত প্রথার (Hereditary Priestship) বিরুদ্ধে গত শতকের বিশেষ দশকে অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিখরা আন্দোলন শুরু করে। অমৃতসর স্বর্ণমন্দির শিখদের কাছে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাস্থল। এর মধ্যে যে সরোবর আছে তার কেন্দ্রে অবস্থিত হরমন্দির সাহিব ও অকাল তখত। গুরুদ্বারগুলিকে মুক্ত করবার জন্য যে আন্দোলন হয় তাকে কংগ্রেস সমর্থন করে। এই আন্দোলন অকালি আন্দোলন এবং এর মধ্যে দিয়েই অকালি দলের জন্ম। ইংরেজ 'শাসনের দমনপীড়ন সত্ত্বেও এই আন্দোলন জয়লাভ করে এবং বংশানুক্রমিক পুরোহিততন্ত্রের অবসান ঘটে।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় পাঞ্জাব দুর্ভাগ্যজনক ও ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। উভয় সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ মানুষ হতাহত হয়। পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বিরাট সংখ্যক হিন্দু ও শিখ এপারে চলে আসে। পূর্ব পাঞ্জাব থেকেও বিরাট সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে চলে যায়। এপারে নির্যাতিত ও দেশত্যাগী মানুষদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী ও অকালিদের প্রভাব গড়ে ওঠে। তবে কংগ্রেসও তার প্রভাব বজায় রেখেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তার গণভিত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস পাঞ্জাবে ক্ষমতায় অসীন ছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পাঞ্জাবে পরাস্ত হয়। অকালি দল, জনসংঘ, সিপিআই প্রভৃতি মিলে 'সংযুক্ত বিধায়ক দল' (এসভিডি) মন্ত্রিসভা গঠন করে। জনসংঘ যা ছিল হিন্দুত্ববাদী এবং অকালি দল একটি ধর্মীয় সংগঠন তাদের সঙ্গে একত্রে মন্ত্রিত্ব করতে যাওয়ায় ওই সময়ে সিপিআই দলের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিতর্ক শুরু হয়। এই এসভিডি মন্ত্রিসভায় অবশ্য অচিরেই জনপ্রিয়তা হারায় ও কংগ্রেস পুনরায় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসে।

কংগ্রেসের ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ফলে অকালি দল আরও জঙ্গি দাবি সামনে রেখে পুনরায় সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা শুরু করে। স্বাধীনতার পর থেকে তাদের দাবি ছিল একটি 'শিখ সুবা' গঠনের। যার ফলে পাঞ্জাব ভেঙে হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ রাজ্য দুটির জন্ম হয়েছিল। এবার ১৯৭৩ সালের 'আনন্দপুর সাহিব' নামক স্থানে একটি সম্মেলন করে অকালি দল ' আনন্দপুর সাহিব ' প্রস্তাব গ্রহণ করে। কী ছিল এই প্রস্তাবে।

দাবিগুলি হল— ক) চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়ে দিতে হবে খ) অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলির যেসব অঞ্চলে পাঞ্জাবিভাষী মানুষেরা বাস করে , সেই এলাকাগুলি পাঞ্জাবকে দিয়ে দিতে হবে গ) ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, মুদ্রা ও যোগাযোগ ছাড়া সব ক্ষমতা রাজ্যের যাতে দিয়ে দিতে হবে। ঘ) সামরিক বাহিনীতে শিখদের অনুপাত বাড়াতে হবে ইত্যাদি। ১৯৭৩ সালে, ইন্দিরা গান্ধি তখন সদ্য বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেছেন। পাকিস্তান পর্যুদস্ত হয়েছে। তাঁর কাছে এই দাবিগুলি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়নি এবং তিনি এগুলিকে কোনও গুরুত্বও দেননি। কিন্তু এই আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই এক দশক পরে পাঞ্জাব চূড়ান্ত অশান্ত হয়ে ওঠে। যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধি নিহত হন। কমিউনিস্টদের পাঞ্জাবে প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

(ক্রমশ)

বন্ধুতার পাঁতা

সুধেন্দু দাশগুপ্ত

সকলের কলকাতা

কলকাতা শহরে একই এলাকায় থাকে নানা বর্ণের মানুষজন, তারমধ্যে হিন্দু ও মুসলমান।

কলকাতায় আছে হিন্দু বিসর্জন, মুসলমান বিসর্জন। মৃতদেহ সৎকারের জন্য আছে মুসলমানদের কবর স্থান, হিন্দুদের শ্মশান।

কলকাতায় ৩টি প্রধান ফুটবল দল — মোহন বাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং। তিনটি দলেরই খেলোয়াড়ই মুসলমান ও হিন্দু।

কলকাতায়, পশ্চিম বাংলায় হিন্দুদের দুর্গা পুজোয় বিসর্জনের মিছিল বের হয়, মুসলমানদের মহরমে মিছিল বের হয়।

কলকাতায় একটি শিক্ষালয়ের নাম হিন্দু স্কুল, একটি শিক্ষালয়ের নাম মোহামেডান অবজার্ভেটরি কলেজ।

কলকাতার একই সিনেমা-দর্শকেরা ভীড় জমায় হিন্দু নায়কের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও মুসলমান নায়কের অভিনেত্রী ও অভিনেতার সিনেমা দেখতে

কলকাতায় হিন্দু পুরুষরা

২

পড়ে পাজামা পাঞ্জাবী শার্ট প্যান্ট। মুসলমান পুরুষরা শার্ট প্যান্ট পাজামা পাঞ্জাবী।

মুসলমান পুরুষদের গালে দাড়ি, হিন্দু পুরুষদের গালে দাড়ি।

মুসলমান মহিলার পরনে শাড়ি, হিন্দুমহিলার পরনে শাড়ি
(পরনে বানান ভুল লিখেছি পড়নে হবে, মাফ চাইছি)

কলকাতায় হিন্দু স্থাপত্য, ইসলামী স্থাপত্য।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা শিখতে আসে বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রী ছাত্ররা।

হিন্দুদের বিয়েতে সানাই বাজায় মুসলমান শিল্পী।

হিন্দু বিয়ের শোভাযাত্রায় ব্যান্ড পার্টির দলে মুসলমান বাদক।

চীৎপুরে মসজিদের পাশে খাবার মেলায় ভীড় জমায় হিন্দু খাদ্য রসিক।

কলকাতার রাস্তার নামে হিন্দু নাম ক্ষুদিরাম বসু সরণি, মুসলমান নাম কবি ইকবাল রোড।

কলকাতায় কলুটোলায়, বড়বাজারে, বৌবাজারে কলিঙ্গায়, পার্কস্ট্রিটে, বামুন বস্তিতে একসাথে বসবাস মুসলমান ও হিন্দু বাসিন্দাদের।

কলকাতায় ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি পালন করে সব ধর্মের লোক।

কলকাতায় একজন

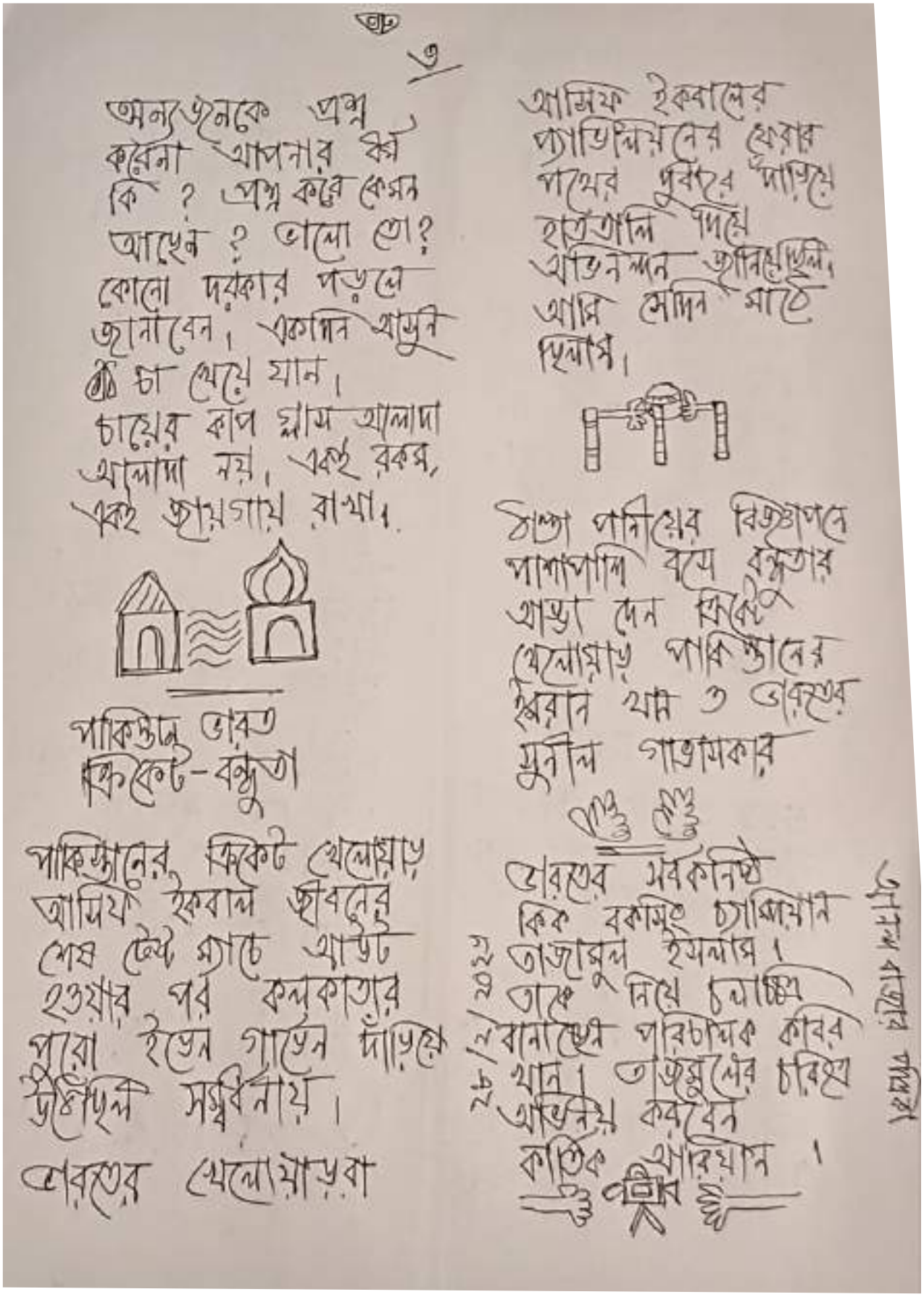

অন্যজনকে প্রশ্ন করেনা আপনার ধর্ম কি? প্রশ্ন করে কেমন আছেন? ভালো তো? কোনো দরকার পড়লে জানাবেন। একদিন আসুন চা খেয়ে যান। চায়ের কাপ গ্লাস আলাদা আলাদা নয়। একই রকম, একই জায়গায় রাখা।

পাকিস্তান ভারত ক্রিকেট-বন্ধুতা

পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলোয়াড় আসিফ ইকবাল জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচে আউট হওয়ার পর কলকাতার পুরো ইডেন গার্ডেন দাঁড়িয়ে উঠেছিল সম্বর্ধনায়।

ভারতের খেলোয়াড়রা আসিফ ইকবালের প্যাভিলিয়নের ফেরার পথের দুধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল। আমি সেদিন মাঠে ছিলাম।

ঠাণ্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপনে পাশাপাশি বসে বন্ধুতার আড্ডা দেন ক্রিকেট খেলোয়াড় পাকিস্তানের ইমরান খান ও ভারতের সুনীল গাভাসকার

ভারতের সর্বকনিষ্ঠ কিক বকসিং চ্যাম্পিয়ান তাজামুল ইসলাম। তাকে নিয়ে চলচ্চিত্র বানাচ্ছেন পরিচালক কবির খান। তাজমুলের চরিত্রে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

আলাউদ্দিন খানের নাতি আদিম খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত 'সঙ্গীত সম্পন্ন' অনুষ্ঠান।
শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন স্বপন চৌধুরী, নিত্যানন্দ হলদিপুর, সাবির খান, পার্থ বসু, সিরাজ আলি খান আরও অনেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪/২/২০২৬

আকবর - বীরবল

ভারত সম্রাট আকবরের সভাসদদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কৃতী ব্যক্তি ছিলেন।
তাদের মধ্যে যে নয়জন আকবরের দরবারে 'নবরত্ন' নামে পরিচিত ছিলেন তারা হলেন — রাজা বীরবল, রাজা টোডরমল, তানসেন, আবুল ফজল, কবি ফৈজি, আবদুল রহিম খান, ফকির সাজিউদ্দিন, সেনাপতি মানসিংহ এবং মোল্লা দো-পিঁয়াজা।
কথিত আছে নবরত্নের মধ্যে আকবরের সবচেয়ে প্রিয় এবং বিশ্বাস ভাজন ছিলেন রাজা বীরবল।
তিনি ছিলেন আকবরের রাজ দরবারের বিদূষক, সংগীতজ্ঞ এবং কবি।
বীরবল আকবরের ঘনিষ্ঠতম সভাসদ ছিলেন।
বীরবলের প্রকৃত নাম মহেশ দাস। ১৫২৮ সালে ত্রিবিক্রমপুর শহরে জন্মে ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান।
আকবর তাকে 'বীরবল' নাম দেন এবং 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনাবিল সিদ্ধান্ত, আকবর-বীরবল ফুল বন্দী,

